রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাদশ ভাগ — ১ম—৪র্থ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-
ব্যাকরণতীর্থ, পত্রিকাধ্যক্ষ।

রঙ্গপুর

(রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়
কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত)

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী)

সূচী

কলিকাতা।
৯, বিশ্বকোষ-লেন, বাগবাজার,
বিশ্বকোষ প্রেসে
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।
১৩২৪

বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।] [ডাকমাশুল ।৶০ আনা।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে
এই পত্রিকা পাইবেন।

☞ কোনও সদস্যের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে অবিলম্বে জানাইবেন।

নিবেদন

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের পরলোকগত সদস্য নাহডাঙ্গা নিবাসী পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশের নাম রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবৃন্দের অনেকেই অবগত আছেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে পরিষদের অধিকাংশ হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত ইঁহার নাম বিজড়িত আছে। ইঁহার সুলিখিত প্রবন্ধরাজি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুস্তক ও পুঁথি, মূর্ত্তি ও তাম্রমুদ্রাদি সংগ্রহ দ্বারাও পূর্ণেন্দুবাবু পরিষদের গৌরব-বর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষদের হিতানুষ্ঠানকল্পে পূর্ণেন্দু বাবু যাহা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের বিগত ত্রয়োদশ বার্ষিক দ্বিতীয় অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য-বৃন্দ পূর্ণেন্দুবাবুর নিঃস্ব পরিবারবর্গের জন্য অর্থ-সংগ্রহ-কল্পে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি এতদর্থে যাহা কিছু সাহায্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ প্রকাশে যথাসম্ভব সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিলে বাধিত হইব। অতি ক্ষুদ্র দানও সাদরে গৃহীত হইবে ই,ত।

বশংবদ

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক,

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ।

রঙ্গপুর-পরিষদ-গ্রন্থাবলী।

১। চণ্ডিকাবিজয়। (মহাকাব্য)

রঙ্গপুরের কবি দ্বিজ কমললোচন কৃত শক্তিবিষয়ক আদিগ্রন্থ।

ডিমাই ৮ পেজী আকারের প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ উপাদেয় সটীক গ্রন্থের অর্দ্ধমূল্য—কাগজের মলাট ।০ আনা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই করা ৸০ আনা।

২। আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয় সম্পাদিত। সভ্যেতর ব্যক্তিগণের পক্ষে মূল্য ।০ আনা।

৩। গৌড়ের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। (হিন্দুরাজত্ব)

মালদহের সুযোগ্য পণ্ডিত ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সঙ্কলিত এই ইতিহাসগ্রন্থ সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য কাগজের মলাট ৸০ এবং সুন্দর বাঁধাই করা ১৲ টাকা।

৪। বগুড়া—সেরপুরের ইতিহাস।

বঙ্গের সুলেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ।০ আট আনা মাত্র।

৫। বগুড়ার ইতিহাস। (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল, মহাশয় রচিত এই গ্রন্থে সমগ্র বগুড়ার যাবতীয় বিবরণ গ্রন্থকার কর্তৃক বিস্তৃতভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ ও ১।০, এই সভার সভ্যগণের পক্ষে ।৵০ ও ৸৵০ আনা মাত্র।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

[সম্মিলন-সংখ্যা]

(উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের, রঙ্গপুর অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী)

কাপলের নিরীশ্বরবাদ।

মাননীয় সভাপতি মহোদয় ও সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ,

বাগ্‌দেবতার বরেণ্য সন্তানগণের এই শুভ-সম্মিলনে, সুযোগ্য, সুবিজ্ঞ সাহিত্য-মহারথগণের এই সমবায়-স্থানে, অজ্ঞ, অযোগ্য মাদৃশ জনের প্রবন্ধ পাঠ করিতে দণ্ডায়মান হওয়া দুঃসাহসিকতার কার্য্য সংশয় নাই। কিন্তু আমি জানি, সংসারে সুবিমল সৌরকর-ধারার প্রাচুর্য্য, সুধাংশুর স্বচ্ছ-রজত-কিরণ প্রবাহের আতিশয্য, তারকাজ্যোতির সৌন্দর্য্য, মানবের মনোরাজ্যে আলোকের পুলকস্রোতঃ বহাইয়া দিলেও কোনও সহৃদয় মানবই খদ্যোতের ক্ষীণ ক্ষণিক আলোকের বিলোপ কামনা করেন না। এ জগতে ক্ষুদ্রের ক্ষীণের স্থান আছেই আছে, না থাকিলে মহত্ত্বের গুরুত্বের গৌরব কোথায়? এ সংসারে 'অল্প'ই জীবকে 'ভূমা'র মহিমা বুঝাইয়া দেয়, অজ্ঞ জীবই সর্ব্বজ্ঞের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে। এই আশ্বাসে—এই বিশ্বাসে—আমি এই মহাতীর্থে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। মহোদয়গণ গাম্ভীর্য্যের মহাসাগর, চপল শফরীর চটুল উদ্বর্ত্তন তাহাতে বিলীন হইয়া যাইবেই যাইবে; সুতরাং আশা করি ক্ষমার্হ হইব।

সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেষ্টা সিদ্ধর্ষি কপিল জ্ঞান-রাজ্যের সম্রাট্। কপিল ভারতবাসীর নিকট "আদি বিদ্বান্" নামে পরিচিত। বেদে কপিলকে 'ঋষি' বলা হইয়াছে। সমাধিনির্ম্মল প্রজ্ঞাবলে যাঁহারা তত্ত্ব-দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারাই তত্ত্বদ্রষ্টা বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। আদি বিদ্বান্ ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিল, নির্দ্দোষ প্রজ্ঞার সাহায্যে যে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সাংখ্যশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। কপিল স্বানুভূতির উপর সাংখ্যশাস্ত্রের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই সাংখ্য শাস্ত্র বেদবাদীর দর্শন না হইয়া যুক্তিবাদীর দর্শন হইয়াছে। এইজন্যই পরবর্ত্তিগণ কপিল-মতকে বেদবিরুদ্ধ বলিতে সুবিধা পাইয়াছেন। কপিলদেবের এই প্রজ্ঞালোকদৃষ্ট তত্ত্বসমূহের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বগুণগণবান্ ভগবানের স্থান নাই। কপিলের সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞাননেত্রে সর্ব্বজ্ঞান-প্রসূতি পরমেশ্বর প্রতিভাত হন নাই। কাপিলসাংখ্য "নিরীশ্বর দর্শন" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। জনরবের কোটিকণ্ঠ নিরীশ্বর-সাংখ্য কপিল-দর্শন ও সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনকে লক্ষ্য করিয়াই ঘোষণা করিতেছে—

"সাঙ্খ্যাঃ নিরীশ্বরাঃ কেচিৎ কেচিদীশ্বরবাদিনঃ।"

সিদ্ধর্ষি কপিল সাঙ্খ্য-প্রবচন-সূত্রে নিরীশ্বরবাদের বীজ বা মূলমর্ম্ম গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। কালের আনুকূল্যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুগ্রহে, অধুনা তাহা বিরাট্ বিটপীতে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে যে ফল প্রকাশ পাইবে, তাহা জগজ্জীবের ত্রিতাপজ্বালা নিবারণ বা বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইবে; বস্তুতঃ সে ফল সুধাফল কি বিষফল, তাহা সুধিবৃন্দই জানেন।

সাঙ্খ্যপ্রবচনসূত্রে প্রথম অধ্যায়ে ৯২।৯৩।৯৪।৯৫ সূত্রে নিরীশ্বরবাদের অবতারণা দৃষ্ট হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৬।৫৭ সূত্রে নিরীশ্বরবাদে সেশ্বরমতের স্থান অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের উপপত্তি দেখা যায়। পঞ্চম অধ্যায়ে ২য় সূত্র হইতে ১২শ সূত্র পর্য্যন্ত নিরীশ্বরবাদে যুক্তির উল্লেখ ও সেশ্বরবাদে দোষারোপ বিদ্যমান।

মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন—ঈশ্বর প্রমাণসিদ্ধ নহেন। সমীক্ষ্যাপরীক্ষার বিচারালয়ে প্রমাণের মানদণ্ড যাঁহার প্রতিকূলে, তাঁহার পরাজয় অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রমাণপটল যাঁহার অনুকূল পৃষ্ঠবল, তিনি জয়ে ইষ্টফল-লাভে হৃষ্ট হন, ইহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। কপিলের মতে প্রমাণ তিনটি, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। ইহার কোনওটি ঈশ্বরের পক্ষ সমর্থন করে না. ইহাই কপিলের ধারণা। তিনি বলিয়াছেন—"প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ", "সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং", "শ্রুতিরপি প্রধান কার্য্যত্বস্য।"

ঈশ্বর প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ নহেন, অনুমান প্রমাণও তাঁহার অনুকূলে নহে, কারণ অনুমানে প্রত্যক্ষপূর্ব্বক ব্যাপ্তি চাই; শব্দপ্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, কেননা শব্দ বা শ্রুতি-প্রমাণ জগতের কারণরূপে প্রধান বা প্রকৃতিকেই নির্দ্দেশ করে, ঈশ্বরের জগৎ-স্রষ্টৃত্ব শ্রুতিসম্মত নহে।

এই তিনটি সূত্রের মধ্যে নিরীশ্বরবাদের রক্ষাকবচ গুপ্তভাবে বিদ্যমান। পরবর্ত্তিগণ ইহার সাহায্যেই প্রধানতঃ তাঁহাদের মততত্ত্বের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, নির্দ্দোষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাজ্যের অমৃত-ফল। এই প্রত্যক্ষ কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রচার করে? কপিল বলেন, কখনই নহে! ভক্ত আস্তিক বিশ্বাসী সাধক মেঘমন্দ্রে বলিবেন, "গর্ব্বিত দার্শনিক, বৈচিত্র্যময়ী মায়া-যবনিকার অন্তরালে জ্ঞানময়, প্রেমময়, করুণাময় সর্ব্বময় ঈশ্বর বিরাজমান, তিনি আত্মলীলাবশে বিভোর; একবার তাঁহার করুণা ভিক্ষা কর; তিনি দয়া করিয়া আবরণ উন্মোচন করিলে তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, নতুবা তোমার সাধ্য কি যে তাঁহার স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হও? তাঁহার কৃপাবল সম্বল লইয়া কত ভক্ত, কত সাধক তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তুমি তাহার কি সংবাদ রাখ?" প্রত্যুত্তরে কপিল বলিবেন, ভক্ত! তোমার সুখসুপ্তি ভঙ্গ করিতে চাই না। তুমি বিশ্বাসের মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া আত্মহারা হইয়াছ; তুমি যাহা দেখিতেছ, সে তোমার আন্তরিক ভাবের বহির্ব্বিকাশ—মানস-জগতের বাহ্যমূর্ত্তি। সে ঈশ্বর তোমার স্রষ্টা নহেন, তুমিই তাঁহার

স্রষ্টা। আমি জ্ঞান-রাজ্যের তত্ত্ববিচার করিতেছি। জ্ঞানসাধন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, ইহারাই জ্ঞানরাজ্যের মানদণ্ড। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—জড়জগতের পঞ্চবিধ ভাবধারা—পঞ্চবিধ স্পন্দন বা পঞ্চভূত গুণের পরিচয় দিতে পারে; ইহারা পরিণাম-স্বভাব পঞ্চবিধ জড়বস্তুর ধারণা বহন করে। ইহাদের অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ এই দ্বিবিধ প্রণালি আছে। অন্তঃপ্রবাহে ইহারা মনের অন্তরিন্দ্রিয়ের বা জ্ঞানকেন্দ্রের উত্তেজনা সাধন করে, বহিঃপ্রবাহে ইহারা জড়জগতের ভাবধারার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বহির্জ্জগতের অস্তিত্ববোধের অনুকূল স্পন্দন লাভ করিয়া থাকে।

মন বহির্জ্জগতের জ্ঞানলাভে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। অন্তর্জ্জগতের তত্ত্বসমূহ অন্তরিন্দ্রিয়ের অধিগম্য বটে, কিন্তু সংস্কারবর্জ্জিত উপরাগবিহীন অমল অন্তঃকরণে আত্মতত্ত্ব, পুরুষতত্ত্ব বা চিৎসত্তা, অন্য কোনও তত্ত্ব প্রকাশ পায় না! ঈশ্বর যদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচর হন, তবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন না, পরন্তু পরিণাম-স্বভাব জড়পদার্থে পরিণত হন। শুদ্ধান্তঃ-করণেও ঈশ্বরের প্রকাশ দেখা যায় না। যাঁহারা ঈশ্বর দর্শন করেন, তাঁহারা অন্তর্জ্জগতের আবাল্যসঞ্চিত সংস্কারানুগত নিবিড় চিন্তারাশির কল্পিত বাহ্যরূপ দর্শন করেন মাত্র, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন, ঐ রূপ পূতিবাষ্পজ আলোকের ন্যায় অচিরস্থায়ী। উহা নিত্য সত্য বা তত্ত্ব নহে। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ জড়পদার্থের পরিণামিত্বই স্বভাব। একমাত্র নির্ব্বিকার আত্মতত্ত্ব প্রমাণসিদ্ধ বটে, কিন্তু তাহার সহিত ঈশ্বরত্বের সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব। ঈশ্বরবাদিগণ ঈশ্বরকে জগৎস্রষ্টা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, ঘট দ্বারা যেমন ঘটকারের অনুমান হয়, জগৎ দ্বারাও তেমনি জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে। কার্য্য কারণের অনুমাপক, সৃষ্টি স্রষ্টার জ্ঞাপক। কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ না হইলে অনুমান নির্দোষ হয় না। যে ব্যক্তি একজন ঘটকারকে একটি ঘট নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়া, ঘট ও ঘটকারের সম্বন্ধ বুঝিয়া লইয়াছে, সেই অপর একটি ঘট দেখিলে উহা নিশ্চয়ই এক ঘটকার কর্ত্তৃক গঠিত এরূপ অনুমান করিতে পারে। জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর এ ভাবে অনুমিত হইতে পারেন না, কারণ তিনি প্রত্যক্ষগম্য নহেন। জগৎ কার্য্য ও ঈশ্বর কারণ, এতদুভয়ের সম্বন্ধও প্রত্যক্ষ নহে। কপিল বলেন, সূক্ষ্মদর্শিগণ জগত্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে তাহার অভ্যন্তরে চিৎসংযোগে জড়ের পরিণতি বা ভাবান্তরাপত্তি দেখিবেন, অন্য কিছুই পাইবেন না। আকর্ষণ-বিকর্ষণ, সংযোজন-বিযোজন, সংকলন সম্মিলন, কৈন্দ্রিক ও পারিধ শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত, অন্তঃস্রোত-বহিঃস্রোত-চলন, স্খলন—নব আবর্ত্তন, নব পরিস্পন্দন এই সবই ত জগতের ব্যাপার। এই পরিবর্ত্তন ধারার ব্যাখ্যা করিতে হইলে জড়ের পরিণতি ও চেতনের অনুগ্রহ মানিতেই হইবে। সাংখ্যশাস্ত্রও জড় ও চিৎ, প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয়ের সাহায্যে জাগ-তিক বিকাশের ব্যাখ্যা করে। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত কোথায়? যদি ঘটনির্ম্মাণে ঘটকারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা হয়, তবে চিন্তা করা কর্ত্তব্য, আবশ্যকের অনু-রোধে প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয় না। ঘট-নির্ম্মাণের একজন দেহী জীব কর্ত্তা, কিন্তু বায়ুপ্রবাহে

বীজমান ও আর্দ্রভূমিপতিত বাসন্তিক বীজ যে অনল্পকাল মধ্যেই বৃক্ষে পরিণত হয়, তাহাতে ত কেহই কর্ত্তার প্রয়োজন হয় না। জগতে নানারূপ পদার্থ বিদ্যমান, প্রাকৃতিক পদার্থগুলি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ক্রমেই উৎপন্ন বা পরিণত হয়, আর যে গুলি কৃত্রিম পদার্থ তাহা জীবগণের সাহায্যে পরিণতিপ্রাপ্ত হয়। জগৎ বহুকার্য্যসমষ্টি। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন, চৈতন্যের অধিষ্ঠানে, প্রকৃতির অনুশীলনে, ধীরে ধীরে নির্ব্বাহিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের প্রয়োজন কোথায়? ঈশ্বরবাদী বলিতে পারেন, "সংসারে সমস্ত কার্য্যের মধ্যে আমরা অভিসন্ধিমূলকতা দর্শন করি; কোনও অন্ধ জড়-শক্তির কার্য্য হইলে, ইহাতে এত শৃঙ্খলা, এত নৈপুণ্য, এত গূঢ়, অভিসন্ধির পরিচয় থাকিত না। এ জগৎ যেন কোনও বুদ্ধিমান্ সুকৌশলী মহাপুরুষ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক পদার্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে কপিলের প্রত্যুত্তর এই যে, যাহাকে অভিসন্ধি, কৌশল-নৈপুণ্য ইত্যাদি বলা হইতেছে, তাহা চেতনাবান্ দেহীর নিজস্ব নয়। একটী বৃক্ষপত্র, একটী পুষ্প, একটী ধাতুখণ্ড বা একটী জীবদেহে যে নৈপুণ্য বা অভিসন্ধির পরিচয় আছে, তাহা প্রকৃতিরই অসীম মহিমা ঘোষণা করে। চেতনাবান্ দেহীর কার্য্যে অভিসন্ধি পরিচয় পাই, ইহা যেমন সত্য, তেমনি একটী জড় বস্তুর বিবর্ত্তন-প্রণালী লক্ষ্য করিলেও উহাতে অভিসন্ধির প্রচুর পরিচয় পাইব, সন্দেহ নাই। যে শৃঙ্খলাকে আমরা অভিসন্ধিমূলক মনে করি, তাহা জড়জগতে আরও সুন্দরভাবে বিদ্যমান, সুতরাং উহার সহিত চেতনাবানের অভিসন্ধির কোনও সম্পর্ক নাই। যে বিশেষ বিশেষ কৃত্রিম কার্য্যে জীবের অভিসন্ধি প্রকাশ পায়, সে সকল স্থলে তত্তৎ কার্য্যের মূলে জীবের হস্তাবলেপ স্বীকার্য্য। সমগ্র জগৎ একটী বহুকার্য্যসঙ্কুল বিরাট্ যন্ত্র, ইহার নানা অংশের কার্য্য নানারূপে নির্ব্বাহিত হয়। সমগ্র জগতের একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বাধীনেচ্ছাবান্ কর্ত্তা থাকিতে পারেন না। যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, নিরঙ্কুশেচ্ছাবান্, দয়াময়, প্রেমময় পরমেশ্বরের হস্তে জগদ্ব্যাপারের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিতে আগ্রহান্বিত, মহর্ষি কপিল তাঁহাদের নিকট সুতীক্ষ্ণ শরসম কতিপয় প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কপিল বলিলেন, যুক্তিবলে ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে হইলে যুক্তির পরীক্ষা করিতে হইবে। ঈশ্বরকে যাঁহারা স্রষ্টা পুরুষ বলিবেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, ঈশ্বর কি মুক্ত পুরুষ না বদ্ধ পুরুষ? বদ্ধ বা মুক্ত ভিন্ন অন্যবিধ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য নয়। ঈশ্বরকে বদ্ধ বা মুক্ত যাহাই বল না কেন, উভয় মাপ্যসৎকরত্বম্। ঈশ্বর যদি মুক্ত হন, তবে তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন না। কারণ মুক্ত পুরুষের রাগ থাকিতে পারে না। আবার রাগ ব্যতীত কর্ত্তৃত্বও অনুপপন্ন। রাগী পুরুষই ইষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে উপকরণের আয়োজন করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহ করে, রাগহীন আপ্তকাম ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। যদি ঈশ্বর রাগযুক্ত হন, তবে তিনি আপ্তকাম বা পূর্ণ হইবেন কিরূপে? যদি আপ্তকাম না হন, তবে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব কেবল বাগ্‌বিড়ম্বনামাত্র। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞানবান্, তিনি কি কামনার তাড়না ও আশার কশাঘাত সহ্য করেন? যদি ঈশ্বর বদ্ধ হন, তাহা হইলেও তিনি অজ্ঞতা ও

অসামর্থ্যবশতঃ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না। যে অজ্ঞ অসমর্থ জীব, অবিদ্যার অঞ্চলছায়ায় অবস্থান করে, যে আত্মপরিত্রাণের উপায় পথে অন্ধবৎ বিচরণ করে, অথচ আত্মোদ্ধারে অকৃতার্থ হয়, সে কি বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ডের স্রষ্টা হইবার যোগ্য? কপিল আরও বলেন—ঈশ্বরকে যাঁহারা জ্ঞানময় গুণময় করুণাময় বলেন, তাঁহারা কি বুঝিতে পারেন না যে, জগতে জ্ঞানগুণকরুণার পরিচয় প্রকটিত নাই? তাঁহারা জ্ঞানীর কার্য্যের অন্তস্তলে প্রবেশ করুন; দেখিবেন, জ্ঞানবানের কার্য্যের মূলে হয় স্বার্থসত্তা, নয় পরার্থপরতা বা করুণাপ্রচিত্ততা রহিয়াছে। যদি জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরকে স্বার্থান্বেষী অনাপ্তকাম আকাঙ্ক্ষার দাস মনে করিতে হয়, তবে কি ঈশ্বরবাদীর হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে পারে? ঈশ্বরবাদী ঈশ্বরকে আপ্তকাম বলেন, সুতরাং স্বার্থকলঙ্কপঙ্ক ঈশ্বরের ললাটাঙ্কে স্থান লাভ না করে, ইহা তিনি অবশ্যই প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর যদি করুণাপরবশ হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে বোধ হয় আমরা এ সংসারে রোগ-শোক, দুঃখ-দৈন্য, যাতনা—বেদনা, অভাব-অভিযোগ, অত্যাচার-অনাচার, অশান্তি উপদ্রব দেখিতে পাইতাম না। ঈশ্বরের কারুণ্য-কল্পবৃক্ষে যদি জীবের ভাগ্যে এই সকল বিষফলই ফলিয়া থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করিব করুণা, কি নিষ্ঠুরতার নামান্তর, না রূপান্তর? সংসারে বিজলী বিকাশের মত ক্ষণিক সুখশান্তি আছে বটে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, এই সংসার মরুভূমির তীব্রতাপে পূর্ণ; এখানে শ্মশানের অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গার, ভগ্নস্তম্ভ, ছিন্ন বস্ত্র, ভস্মস্তূপ, আর দুর্ব্বহ অনাশ্বাস, হাহুতাশ চিরসঞ্চিত। এ সংসার কোনও করুণাময় জ্ঞানময় ঈশ্বরের রচনা নহে। ইহার যদি কর্ত্তা কেহ থাকেন, সম্ভবতঃ তিনি নির্দ্দয়, নির্ব্বিবেক। আর একটী কথা এই যে, ঈশ্বর কাহার প্রতি করুণাপরায়ণ হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? জীবের প্রতি? জীব যখন সংসারের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয় নাই, তখন কাহার দুঃখে ঈশ্বরের হৃদয়ের তারে করুণার সুর বাজিবে? করুণাপর ঈশ্বর সুখী জীব সৃষ্টি করিতে পারিতেন না কি? যদি বলা যায়, সৃষ্টিসংহার-চক্র অনাদিকাল হইতে আবর্ত্তিত হইতেছে, এ প্রবাহের আদি নাই, সৃষ্টির আদি নাই, সংসার অনাদি, জীবও অনাদি, জীবকর্ম্মও অনাদি, কর্ম্মানুসারী সুখদুঃখভোগও অনাদি, ঈশ্বর ইহার ব্যতিক্রম করিতে অনিচ্ছুক, কারণ তিনি কর্ম্মফলদাতা; প্রত্যুত্তরে বলা যাইবে, ঈশ্বর সৃষ্টি করেন কি? জীব, কর্ম্ম বা অদৃষ্ট, সুখ-দুঃখ ভোগের আয়তনে জড় উপকরণ, জীবের কর্ম্মশক্তি সবইত আছে, ঈশ্বরের স্থান কোথায়? যদি বলা যায়, এই সকলের কার্য্যোপযোগী সকল সংযোগ সাধন করিবেন ঈশ্বর, ঐ সকল পদার্থ যোগ্যভাবে যুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে ফলপ্রসব করিতে অসমর্থ, ঈশ্বরেচ্ছায় উহাদের অনুকূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, ফলোন্মুখতা উপস্থিত হয়, ইহাই ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব; নিরীশ্বরবাদীর প্রত্যুত্তর এই যে, "নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ।" কর্ম্মই ফলনিষ্পত্তির নিদান, ঈশ্বরাধিষ্ঠান অনাবশ্যক। কর্ম্ম যে ফলপ্রদ, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। প্রজ্বলিত হুতাশনে হস্ত প্রদান করিলে অচিরেই কষ্টফল মর্ম্ম-বেদে প্রকাশ পায়, পরমেশ্বরের অপেক্ষা থাকে না। যদি কেহ মনে করেন, জীব কর্ম্মনিষ্পাদনে ঈশ্বরের অধীন; উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসে, উন্মেষ নিমেষেও জীবের স্বাধীনতা নাই; জীব

ঈশ্বরের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হয়; তাহা হইলে তিনি জীবের কর্ম্ম ও ঈশ্বরের কর্ম্মফল-দাতৃত্ব এই উভয়ই অস্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। জীব যদি ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া অসৎ-কর্ম্ম করে, আর ঈশ্বর যদি তজ্জন্য তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করেন, তবে সে ঈশ্বর সমদর্শী বা সর্ব্বজ্ঞ নহেন, তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও বর্ব্বর। বস্তুতঃ কর্ম্মকর্তৃত্বের গুরুভার যদি জীবের মস্তক হইতে অপসারিত হয়, তবে কর্ম্মফলভোক্তৃত্বও জীবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে। তুমি আমার হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ করিয়া আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিষপান করাইবে এবং পরক্ষণে আমাকে আত্মহত্যাভিলাষে বিষপানকারী ও দণ্ডার্হ বলিয়া প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে আমার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করিবে, তুমি কি ন্যায়বান্? তুমি অসীম শক্তিশালী; তুমি অন্যায় করিবে, আমি তাহার প্রতীকারে অসমর্থ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি একবার আমার স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া তোমার এই মহিমান্বিত স্বরূপটীকে একবার ভাল করিয়া দেখিলে, নিজেই বিচার করিয়া বলিবে কি, তুমি কে? আর একটী কথা, জ্ঞান-সাগর ঈশ্বর যদি জীবগণের পরিচালক হন, তবে জীবগণকে কুকর্ম্মে বাধা দেন না কেন? যদি উহা তাঁহার সাধ্যাতীত হয়, তবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ কিরূপে; আর যদি তাঁহার অজ্ঞাত-সারে অগোচরে জীবের কুকর্ম্ম করিবার সাধ্য থাকে, তবে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বই বা কিরূপ? যে বিচারক অপরাধকর কার্য্য-সম্পাদনের সময়ে জ্ঞানসত্ত্বে ও সাধ্যসত্ত্বে অপরাধকারীর নিরস্তির ব্যবস্থা করেন না, প্রকারান্তরে পাপের অনুমোদন করেন, পরে যথাকালে উদ্যত দণ্ডপরিচালনে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সদ্বিচারক হইতে পারেন, কিন্তু সহৃদয়, সদ্গুণসদন নহেন, ইহা সত্য। বস্তুতঃ জীবের স্বাধীন কর্ম্মশক্তি না মানিলে পাপপুণ্যকার্য্যে দণ্ডমণ্ডন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য হয় না। জীবের স্বাধীন কর্ম্মশক্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বর-স্বীকারের প্রয়োজন আপনিই উপস্থিত হয়। যাঁহারা জীবের স্বাধীনতা ও ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার সমন্বয় সাধনে ব্যস্ত, তাঁহারা দীর্ঘকাল পোষিত সংস্কারের হস্তে ক্রীড়নক স্বরূপে কালাতিপাত করায় ঈশ্বর ধারণার অকিঞ্চিৎকর সৈকতে বালুকাময় প্রাচীর রচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন না যে, যুক্তিবিচারের সামুদ্র ঝঞ্ঝা অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের শ্রম ব্যর্থ করিয়া দিবে, তাঁহাদের সাধের প্রাচীর রেণুকণারূপে শূন্যে বিচরণ করিবে। জীবকর্ম্ম দ্বারাই জগদ্ব্যাপারের ব্যাখ্যা হইতে পারে, ঈশ্বর কল্পনার অবকাশ থাকে না।

কপিল মতে জগতের কর্ত্তারূপে ঈশ্বর অনুমানসিদ্ধ নহেন, কেহ কেহ ঈশ্বরকে বেদ রচয়িতা বলেন, অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার বেদ তাহার কর্ত্তার অগাধ জ্ঞান-সম্পৎ প্রকাশ করে।

এই বেদের কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। কপিল বলেন, বেদ দ্বারা বেদকর্ত্তা ঈশ্বর অনুমিত হইতে পারেন না। কারণ বেদ অপৌরুষেয়, বেদের কেহ কর্ত্তা নাই। ঘট পৌরুষেয় বটে, কিন্তু তৃণাঙ্কুর অপৌরুষেয়; বেদ তদ্রূপ; কঠ, কণ্ব প্রভৃতি বেদপ্রবক্তা ঋষিগণ শিষ্যপরম্পরায় বেদ-প্রচার করিয়া আসিতেছেন। যেমন ক্রমবিকাশ ধারা বাহিয়া জগৎ পরিব্যক্ত হইতেছে, আবার প্রতিলোম প্রবাহক্রমে ক্রমসঙ্কোচের মধ্য দিয়া প্রলয়-দশায় উপনীত হইতেছে, পুনরায়

অনুলোমক্রমে বিকাশলাভ করিতেছে, প্রকৃতি-পুরুষসংযোগে সৃষ্টিসংহারচক্র আবির্ভাব তিরোভাব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে ঈশ্বরের প্রয়োজন হইতেছে না, তদ্রূপ বৈদিক সত্যও পরম্পরাক্রমে প্রচারিত ও সংরক্ষিত হইতেছে। এই বেদ অপৌরুষেয় ও তৃণাঙ্কুরবৎ অনিত্য। এ ধারার মূলে ঈশ্বরের স্থান নাই। বেদ বা শাস্ত্রপ্রমাণও ঈশ্বরের অনুকূল নহে, কারণ অব্যক্ত অক্ষয় প্রধান বা প্রকৃতি হইতে এই জগৎ ব্যক্তভাবে উপনীত হইতেছে, ইহাই বেদের ঘোষণা। "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্"; প্রতিলোমক্রমে কার্য্য হইতে কারণে গেলে আমরা অক্ষর অব্যক্তেরই সাক্ষাৎ পাই। ঈশ্বরের সন্ধান পাই না। বেদের "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ঈশ্বরের বর্ণনাত্মক বাক্যসমূহের উপপত্তি সম্বন্ধে সিদ্ধর্ষি কপিলের অভিমত এই যে, ঐ সকল বাক্য "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসনাসিদ্ধস্য বা," মুক্ত পুরুষগণের প্রশংসাবাদ অথবা উপাসনাসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ অধিকারী জীব হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির ঐশ্বর্য্যবোধক। মুক্ত পুরুষ, বা উপাসনাসিদ্ধ অধিকারী উন্নত জীব, বা প্রকৃতিলীন যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন মহাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বেদে "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ অনাদিসিদ্ধ নিত্য জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর কেহই নাই। যোগশক্তিসম্পন্ন অনিত্য ঐশ্বর্য্যবান্ বলিয়া ঈশ্বর যুক্তিসিদ্ধ। এই ঈশ্বরত্ব প্রত্যেক পুরুষেরই করায়ত্ত, সকলেই সাধনবলে প্রকৃতির প্রভু হইতে পারেন, সকলেই ঈশ্বর হইতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরত্ব অচিরস্থায়ী পদার্থ।

আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সাংখ্যপ্রবচনে যে ঈশ্বরাসিদ্ধি ঘোষিত হইয়াছে, তাহা প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। ঈশ্বর নিরাস অভিপ্রেত হইলে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" না বলিয়া 'ঈশ্বরাভাবাৎ' বলা হইত। আচার্য্যের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে। প্রত্যক্ষপ্রমাণ প্রসঙ্গে সন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষানুভবের কথা বলায় আপত্তি উঠিয়াছে, যোগী প্রত্যক্ষে ও ঈশ্বর প্রত্যক্ষে এ লক্ষণ প্রযুক্ত হইতে পারে না, কারণ যোগিগণ সন্নিকর্ষ ব্যতীতও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন, বঙ্গে বসিয়া নিমীলিত নেত্রে কলিঙ্গের পদার্থ দর্শন করেন। আর ঈশ্বর সন্নিকর্ষাদি ব্যতীত নিত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন, সুতরাং ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষের লক্ষণে বক্তব্য হইতে পারে না। কপিল এখানে বলিয়াছেন, যোগিগণ যোগৈশ্বর্য্যবলে অতীত, অনাগত, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট, সর্ব্ব পদার্থে চিত্ত সন্নিকর্ষ লাভ করেন, তাঁহারা অবাহ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানবান্, বাহ্য প্রত্যক্ষ লক্ষণে তাঁহাদের অলৌকিক প্রত্যক্ষের কথা না বলায় দোষ হয় নাই। আর ঈশ্বর তিনি ত প্রমাণাসিদ্ধই নহেন। সুতরাং ঈশ্বর প্রত্যক্ষের কথা না বলায় দোষশঙ্কা কোথায়? ঈশ্বরের অস্তিত্ব যুক্তিপ্রমাণসিদ্ধ নহে। এখানে যদি ঈশ্বর নিরাস তাঁহার অভিপ্রেত না হইত, তবে তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন, ঈশ্বর নিত্যপ্রত্যক্ষজ্ঞানবান্; এই জন্য প্রত্যক্ষ লক্ষণ সেই নিত্যপ্রত্যক্ষে সমন্বিত না হইলে ক্ষতি কি? যোগিপ্রত্যক্ষের উপপত্তি করিলেন, অথচ ঈশ্বরের অসিদ্ধিই ঘোষণা করিলেন, ঈশ্বর প্রত্যক্ষের উপপত্তি করিতে প্রয়াস পাইলেন না, অধিকন্তু ঈশ্বর স্বীকারের বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করিলেন, ইহা কি অভিসন্ধিপূর্ব্বক নিরীশ্বরবাদ সমর্থন নহেন? যদি কেহ কপিলের নিরীশ্বরবাদকে অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষার নেত্রে অবলোকন করেন

করুন, কপিল তাহাতে ভীত বা সঙ্কুচিত নহেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, নিরীশ্বরবাদই যুক্তিপ্রমাণের নিকটে সুপরীক্ষিত। জীব আত্মতত্ত্ববিবেক লাভ করিলেই দুঃখের পরপারে গমন করিতে পারে, নিজের নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্তভাব অনুভব করিয়া ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইতে পারে, সে জন্য তাহাকে কোনও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানের দ্বারে করুণাভিক্ষা করিতে হয় না। জীব স্বাধীন; সাধনবলে, উপাসনা ফলে সাময়িক ঈশ্বরত্ব করায়ত্ত করিতে পারে। জীব নিত্যমুক্ত, জীব স্বরাট্, ইহাই কপিলের কথা। সিদ্ধর্ষি কপিল জীবের এই স্বাধীনতার প্রথম ও প্রধান প্রচারক। কপিল বুঝাইতে চাহেন, জীব তুমি ক্ষুদ্র নহ, দাস নহ, তুমি মহান্, তুমি স্বাধীন, তোমার অন্তর্নিহিত শক্তি সাধন দ্বারা জাগরিত কর, দেখিবে, তুমি সত্য, শুদ্ধ, তুমি বিশ্বরাজ্যের সম্রাট্, তুমি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। আদি বিজ্ঞান্ কপিল জীবের এই মহত্ত্ব গুরুত্ব প্রচার করিয়া জগতের সম্মুখে যে উজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য মানব-সমাজ তাঁহার নিকট ঋণী কিনা, বিদ্বদ্‌বৃন্দই তাহার বিচারকরিবেন।

আমার বিশ্বাস ঈশ্বর প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হউন্ বা না হউন্, জীব তাঁহাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিবে। চিরকালই ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। বোধ হয়, ইহাও ঈশ্বরের অভিপ্রেত। নচেৎ নিরীশ্বরবাদ-প্রচারক কপিল ঈশ্বরাবতাররূপে পূজিত হইবেন কেন? কপিলরূপী ঈশ্বর কি অনধিকারীর নিকট হইতে স্বীয় গূঢ়স্বরূপ দূরে রাখিবার জন্যই নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। ভগবন্! তোমার তত্ত্ব তুমিই জান, তোমার অস্তিত্বে তুমিই প্রমাণ। লৌকিক প্রমাণের মানদণ্ডে তোমার অসীম মহিমময় স্বরূপের পরিমাপিত না হউক্, ক্ষতি নাই। তুমি যেরূপই হও, দয়াময় বা নির্দ্দয় হও, হৃদয় তোমাকে চায়, তোমাকে কোটিবার প্রণাম করি।

যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ।

শ্রীকেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাঙ্খ্যমীমাংসাপুরাণতীর্থ।

বৌদ্ধধর্ম্মে দুঃখ-নিরোধের উপায় কি?

এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্ব প্রথম প্রশ্ন উঠে, ধর্ম্ম কি? বলা যাইতে পারে, যাহা পাপী তাপী সকলকে ধারণ করে, যাহা পাপী তাপী সকলের দ্বারা ধৃত হয়, যাহা ব্যষ্টি ও সমষ্টির একমাত্র অবলম্বন, যাহা জগতের সর্ব্বস্ব, যাহা থাকিলে লোক সুখী, সন্তুষ্ট, পবিত্র ও পরিতৃপ্ত এবং যাহা না থাকিলে লোক অসুখী, অসন্তুষ্ট, অপবিত্র ও অপরিতৃপ্ত, যাহা ধ্যেয়, যাহা ধ্যান, যাহা পশুকে মানব করে, মানবকে দেবতা করে এবং দেবতাকে জন্ম-মৃত্যুর অতীত করে, যাহা বহুত্বের মধ্যে একত্ব, দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত, যাহা অবিদ্যা ও বন্ধনের

মধ্যে বিদ্যা ও বিমুক্তি, যাহা সরল, যাহা কঠিন, যাহা ঋজু, যাহা বক্র, যাহা তর্কে অমীমাংস্য ও সাধনায় প্রাপ্য, যাহা অহং নাশের হেতু, যাহা বিজয়ের বর্ম্ম, যাহা সাধনা ও সিদ্ধি, যাহা সুখ, যাহা শান্তি, যাহা সত্য, যাহা স্বয়ং নির্ব্বাণ, তাহাই ধর্ম্ম। বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, এ জগতে এমন কিছুই নাই যাহা ধর্ম্ম নামের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। বুদ্ধ, ধর্ম্ম-স্বামী, যম, ধর্ম্মরাজ, বিচারক, ধর্ম্মাবতার, উদ্ভিদেরও ধর্ম্ম আছে, পশুরও ধর্ম্ম আছে, দেবতারও ধর্ম্ম আছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান ও জৈন কেহই ধর্ম্ম ছাড়া নহেন, আমার সাধ্য কি যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এ হেন ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া উহার কূল কিনারা করিতে পারি। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী বলিয়াছিলেন, 'অন্য ধর্ম্মের গ্লানি করা' উচিত নহে, কিন্তু স্বধর্ম্মানুরক্তিই ভাল। তাই আমিও অন্য অন্য কোন ধর্ম্মের আলোচনা না করিয়া, ভগবান বুদ্ধ যে অমৃতময় ধর্ম্ম জগতের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তথাগত বুদ্ধের ধর্ম্ম কি?

"দুক্খং দুক্খ সমুপ্পাদং দুক্খসস চ অতিক্কমং
অরিয়ঞ্চট্ঠঙ্গিকং মগ্‌গং দুক্খূপ সমগামিনং॥

দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় এই চারি আর্য্য সত্যই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম। আধুনিক সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ও ঠিক এই চারি সত্য। চিকিৎসাশাস্ত্রও এইরূপ চতুর্ব্যূহ, যথা—রোগ, রোগের কারণ, রোগমুক্তি ও ভৈষজ্য। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার আলোচ্য বিষয়কে উক্ত ভাবে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এই স্থানে সত্য অর্থে সাংসারিক সত্য। যতদিন সংসার ও সংসারের ভেদ-জ্ঞান, ততদিন উহারা সত্য বুঝিতে হইবে। সংসার অতিক্রম করিতে পারিলে, পাপ-পুণ্যজ্ঞান তিরোহিত হইলে, আর উহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। কথাবত্থুপকরণের মতে চারি আর্য্য সত্য অসংস্কৃত নহে, একমাত্র নির্ব্বাণই অসংস্কৃত। দুঃখের আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে কেহ কেহ pessimism বা দুঃখাত্মবাদ নামে অভিহিত করেন। ইহা ভুল; বৌদ্ধধর্ম্ম কখনও দুঃখাত্মবাদ নহে, দুঃখ পাওয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে, উহার একমাত্র লক্ষ্য সকল দুঃখের অবসান করিয়া পরম সুখ নির্ব্বাণ লাভ করা। দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করা বৌদ্ধধর্ম্মের কেন, জগতে সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য। এক্ষণে দেখা যাউক, দুঃখ কাহাকে বলে?

ভগবান্ বলিয়াছেন, জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত মিলন দুঃখ, প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদ দুঃখ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও রূপ এই পঞ্চ স্কন্ধ দুঃখ। প্রতীত্যসমুৎপাদে ভগবান দুঃখের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ দৌর্ম্মনস্য ও নিরাশা। আমরা বলিতে পারি, আমরা যাহা চাই তাহা না পাইলে, এবং যাহা চাহি না তাহা পাইলে, মনের যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহারই নাম দুঃখ। তাই বুঝি ধর্ম্ম সেনাপতি সারিপুত্র ভাবাবেশে গাহিয়াছিলেন—

চাহি না জীবন, আমি চাহি না মরণ,
কালের প্রতীক্ষা শুধু করেছি এখন।

দুঃখ কাহাকে বলে সংক্ষেপে তাহা নির্দ্ধারিত হইল।

এক্ষণে দেখিব, দুঃখ সমুদয় কি? কি কারণে ও কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয়? কর্ম্মযোগের ভাবে দেখিতে গেলে তৃষ্ণা বা কামনাই দুঃখের মুখ্য কারণ এবং জ্ঞানযোগের ভাবে দেখিতে গেলে অবিদ্যাই দুঃখের মুখ্য কারণ। অবিদ্যা প্রসঙ্গে বৌদ্ধসাহিত্যে অনেক উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। কথিত আছে, একদা মার ভগবানকে বলেন—

'যং বদন্তি মময়িদন্তি, যে বদন্তি মমন্তি চ
এত্থ চ তে মনো অ'ত্থ, ন মে সমণ মোক্খসীতি।"

যাঁহারা বলেন, ইহা আমার এবং যাঁহারা বলেন ইহা আমি, হে শ্রমণ, যদি এইরূপ ধারণা আপনার মনে থাকে, আপনি আমা হইতে মুক্ত নহেন।

ভগবান তদুত্তরে বলেন—

"যং বদন্তি নতং মযহং যে চ বদন্তি নতে অহং
এবং পাপিম জানাহি নমে মগ্‌গাম্পি দক্খসীতি॥

যাঁহার বলেন তাহা আমার নহে, যাঁহারা বলেন তাহা আমি নহি, হে দুর্ম্মতে, জানিও আমার চিত্তের ভাব এই রূপ। তুমি আমার গতিবিধি দেখিতে পাইবে না। ইহাতে বুঝিতে হয় যে, আমিত্ব জ্ঞানই সংসারের মূল, এবং আমিত্ব বর্জ্জনই সংসারের প্রভাব অতিক্রম করিবার প্রশস্ত উপায়।

তথাগত বুদ্ধ উক্ত দ্বিবিধ যোগ ও দ্বিবিধ কারণের সমাবেশ করিয়া বলিয়াছেন, অবিদ্যা হইতে বা অবিদ্যার কারণ সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শাস্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম, এবং জন্ম হইতে বিবিধ দুঃখ হইয়া থাকে। এইরূপে দুঃখের বা জগতের উৎপত্তি হয়। এই অপূর্ব্ব তত্ত্বের নামই প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা কার্য্যকারণ নীতি। এই প্রতীত্যসমুৎপাদের বিশদ ব্যাখ্যা করা সময় সাপেক্ষ, সংক্ষেপে নামোল্লেখ করিলাম মাত্র।

দুঃখ নিরোধ কি? সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বপ্রকারে দুঃখ হইতে বিমুক্ত থাকার নাম দুঃখ নিরোধ। প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুসারে দুঃখ নিরোধ অর্থে অবিদ্যার নিরোধ, সংস্কারের নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধ, নামরূপের নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধ, বেদনার নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধ, উপাদানের নিরোধ, ভবের নিরোধ, জন্মের নিরোধ, জরা, মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও নিরাশার নিরোধ। এই সর্ব্বাঙ্গীন নিরোধের নামই বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ। ভারতের মুক্তি, সাধকের সিদ্ধি, সকল কামনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি বিদ্যা ও বিমুক্তি।

দুঃখ নিরোধের উপায় কি ? দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য্য অষ্টমার্গ, যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি ; আর্য্যমার্গ তিন স্কন্ধে বিভক্ত, যথা—শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। শীল স্কন্ধের অন্তর্গত, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ জীবিকা। সমাধিস্কন্ধের অন্তর্গত, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এবং প্রজ্ঞা স্কন্ধের অন্তর্গত সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প। বিশুদ্ধি মগ্গের গ্রন্থকার উক্ত তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াই বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, সম্যক্ দৃষ্টি সম্যক্ সংকল্প প্রভৃতি কি !

মহা সতিপট্ঠান সুত্তন্তের মতে দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় এই চারি আর্য্য সত্যের নামই সম্যক্ দৃষ্টি। মজ্ঝিম নিকায়ের সম্মাদিট্ঠি সুত্তে ধর্ম্ম-সেনাপতি সারিপুত্র ঠিক এই কথাই বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। সংযুক্ত-নিকায়ের কাচ্চায়ন গোত্ত সুত্তে বর্ণিত আছে, একদা কাচ্চায়ন ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন, সম্যক্ দৃষ্টি কি ? তদুত্তরে ভগবান বুদ্ধ বলেন, হে কাচ্চায়ন ! জগতের লোক নানাভাবে দ্বিবিধ মত পোষণ করে ; যথা—অস্তি ও নাস্তি যাঁহারা কেবল জগতের উৎপত্তি বিষয় সম্যক জ্ঞান দ্বারা যথাভূত দর্শন করেন, তাঁহাদের মনে নাস্তিকতা স্থান পায় না ; এইরূপে যাঁহারা আস্তিকমত পোষণ করেন বা আস্তিক হন। পক্ষান্তরে যাঁহারা কেবল জগতের নিরোধ বিষয় সম্যক জ্ঞান দ্বারা যথাভূতভাবে দর্শন করেন, তাঁহাদের মনে আস্তিকতা স্থান পায় না। এইরূপে তাঁহারা নাস্তিক মত পোষণ করেন বা নাস্তিক হন। উপায়, উপাদান ও অভিনিবেশ দ্বারা জগৎ নিবদ্ধ, কিন্তু যিনি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি তৎসমস্তে আকৃষ্ট বা অনুরক্ত হন না, আমার আত্মা, এইরূপ অধিষ্ঠান বা বদ্ধমূল ধারণা করিয়া বসেন না। দুঃখ উৎপন্ন হইবার কারণ থাকিলে দুঃখ উৎপন্ন এবং নিরুদ্ধ হইবার কারণ থাকিলে দুঃখ নিরুদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে তাহার মনে কোন সংশয় থাকে না। তদ্বিষয়ে তাঁহার অপর প্রত্যয় বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে ; সকল আছে ইহা এক অন্ত, সকল নাই ইহা দ্বিতীয় অন্ত, এই দুই অন্তে না যাইয়া তথাগত বুদ্ধ মাঝামাঝি-ভাবে উপদেশ দিয়াছেন, অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞানাদি উৎপন্ন হয়। এই সূত্র হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রতীত্যসমুৎপাদের অপর নাম সম্যক দৃষ্টি, চারি আর্য্যসত্য প্রতীত্যসমুৎপাদের বিবৃতি মাত্র। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, ভগবান বুদ্ধের সম্যক্ দৃষ্টি অস্তি-নাস্তির অতীত। সংশয়বাদ অকার্য্যকারণবাদ প্রভৃতিরও বিপরীত। তাঁহার দর্শনের মূলে কোন বিশ্বাস নাই, আছে বিজ্ঞান। স্থবির অশ্বজিত যথার্থই বলিয়া-ছিলেন—

"যে ধম্মা হেতুপ্পভবা তেসং হেতুং তথাগত আহ
তেসঞ্চ যো নিরোধ এবং বাদি মহাসমনো।"

হেতুবশতঃ যে সকল কার্য্য সংঘটিত হয়, মহাশ্রমণ তথাগত উহাদের উদ্ভব ও নিরোধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই স্থানে সম্যক দৃষ্টি সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সম্যক সঙ্কল্প ত্রিবিধ ; যথা—নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অহিংসা সংকল্প ও অব্যাপাদ সংকল্প।

মিথ্যা বাক্যের বিপরীত সম্যক্ বাক্য, মিথ্যাবাক্য চতুর্ব্বিধ ; যথা—মিথ্যা কথা, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য ও বৃথালাপ। সত্য গোপন করার নামই মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা বড় দোষ। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে ইহা গুরুতর অপরাধরূপে গণ্য হইয়াছে। এক জনের বিরুদ্ধে অপরকে উত্তেজিত করিবার মানসে এই স্থানের কথা ঐ স্থানে, ঐ স্থানের কথা এই স্থানে বলার নাম পিশুন বাক্য ; ক্রোধবশতঃ অভদ্র জনোচিত ভাষায় নিন্দা বা তিরস্কার করার নাম পরুষ বা রূঢ়বাক্য, রাজা, অমাত্য, চোর, দস্যু প্রভৃতি বিষয়ক অসার গল্পের নামই বৃথা গল্প ; এই চতুর্ব্বিধ মিথ্যা বাক্য হইতে বিরত থাকার নামই সম্যক্ বাক্য।

মিথ্যা কর্ম্মের বিপরীত সম্যক্ কর্ম্ম। মিথ্যাকর্ম্ম ত্রিবিধ, যথা—প্রাণীহত্যা, পরস্বাপহরণ ও মৈথুন। এই ত্রিবিধ দৈহিক পাপ বর্জ্জন করিয়া সকল প্রাণীর প্রতি দয়ালু, প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ-কারী ও ব্রহ্মচারী হইয়া চলার নাম সম্যক্ কর্ম্ম।

মিথ্যা জীবিকার বিপরীত সম্যক্ জীবিকা। শীল স্কন্ধ পাঠে জানিতে পারা যায়, বাস্তুবিদ্যা, মূষিকবিদ্যা, অঙ্গবিদ্যা, বায়সবিদ্যা প্রভৃতি অসদুপায়ের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করার নামই মিথ্যা জীবিকা। যাঁহারা সম্যক্ জীবিকা অনুসরণ করেন, তাঁহারা মংস্য-বাণিজ্য, প্রাণীবাণিজ্য, অস্ত্রবাণিজ্য, বিষবাণিজ্য, উৎকোচ গ্রহণ, বাস্তুবিদ্যা, মূষিকবিদ্যা প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া সৎপথে থাকিয়া সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করেন।

সম্যক্ ব্যায়াম কি ? উৎপন্ন পাপের বিনাশ, অনুৎপন্ন পাপের অনুৎপাদন, উৎপন্ন পুণ্যের সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন এবং অনুৎপন্ন পুণ্যের উৎপাদনের জন্য অধ্যবসায়ী হওয়ার নাম সম্যক্ ব্যায়াম। ব্যায়াম শব্দের অন্য নাম অপ্রমাদ বীর্য্য। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বাবস্থায় পাপ হইতে বিমুক্ত ও পুণ্যে সর্ব্বদা রত থাকাই বৌদ্ধ-বীরত্বের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মপদে ভগবান্ বলিয়াছেন, যিনি সংগ্রামে সহস্রবার সহস্র ব্যক্তিকে জয় করেন, তদপেক্ষা যিনি নিজকে জয় করিতে পারেন, তিনিই সমধিক বীর। কলিঙ্গ যুদ্ধের হত্যাকাণ্ড দেখিয়া দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজও তাঁহার ত্রয়োদশ শিলালিপিতে বলিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বজয় অপেক্ষা ধর্ম্মজয়ই শ্রেষ্ঠ জয়।

সম্যক্ স্মৃতি কি ? সম্যক্ স্মৃতি অর্থে চতুর্ব্বিধ স্মৃত্যোপস্থান, যথা—কায় বিষয়ে কায়দর্শন ; অর্থাৎ কায়সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া ; বেদনা বিষয়ে বেদনা দর্শন, সুখ দুঃখ ও উপেক্ষা বিষয়ে সম্যক্ পরিজ্ঞাত হওয়া ; চিত্ত বিষয়ে চিত্তদর্শন, চিত্তের কার্য্য-কারণ-ভাব পরিজ্ঞাত হওয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে ধর্ম্ম দর্শন, কুশল ধর্ম্ম কি, অকুশল ধর্ম্ম কি, তাহা সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া ; সম্যক্ স্মৃতি যোগাভ্যাসের অন্যনাম মাত্র। সম্যক্ সমাধি কি? বৌদ্ধ সাধকেরা সকল কামনা ও পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধ্যান আরম্ভ করেন। প্রথম অবস্থায় তাঁহার মধ্যে পাঁচটী জিনিষ থাকে, যথা—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা। একাগ্রতা সকল ধ্যানের পক্ষে সাধারণ, কারণ একাগ্রতা বিহনে ধ্যান ত হইতেই পারে না। ইহারই নাম প্রথম ধ্যান। দ্বিতীয় অবস্থায় বিতর্ক বিচার থাকে না, থাকে শুধু সমাধি জনিত প্রীতি ও সুখ। ইহার নাম,

দ্বিতীয় ধ্যান। তৃতীয়াবস্থায় সুখ, একাগ্রতা ও বিরাগ উৎপন্ন হয়। তখন সাধক সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করেন। ইহারই নাম তৃতীয় ধ্যান। চতুর্থাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক সুখ দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ হয়। ইহারই নাম চতুর্থ ধ্যান। তেবিজ্জসুত্তে ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, বৈদিক ঋষি ও প্রাচীন উপনিষদ্‌কার ব্রাহ্মণগণ রূপ ব্রহ্ম ধ্যান পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন। চতুর্থরূপ ধ্যান অতিক্রম করিলে এমন একটী অবস্থায় সাধক উপনীত হয়, যখন তাঁহার জ্ঞান হয় আকাশ অনন্ত। ইহাই আকাশ অনন্ত আয়তন নামক প্রথম অরূপ ব্রহ্ম ধ্যান।

আকাশ অনন্ত আয়তন হইতে সাধক আর এক ধ্যানস্তরে উন্নীত হইলে তাঁহার জ্ঞান হয় বিজ্ঞান অনন্ত। ইহাই বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন নামক দ্বিতীয় অরূপ ব্রহ্মধ্যান।

বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন হইতে সাধক আর এক স্তরে উন্নীত হইলে তাঁহার ধারণা হয় যেন কিছুই নাই। ইহাই অকিঞ্চন আয়তন নামক তৃতীয় অরূপ ব্রহ্মধ্যান।

অকিঞ্চন আয়তন হইতে আর এক স্তরে উন্নীত হইলে সাধক সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞার অতীত হয়েন। ইহাই নৈব সংজ্ঞা বা সংজ্ঞা আয়তন নামক চতুর্থ অরূপ ব্রহ্মধ্যান।

মজ্ঝিমনিকায়ে অরিয় পরিয়েসন সুত্তে বর্ণিত আছে, শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বে রাজগৃহে আরাড়কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকের নিকট যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ অরূপ ব্রহ্মধ্যানের স্তরে আরোহণ করিবার পথ শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ব্রহ্মজালসুত্তেও প্রায় এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে বলিতে পারা যায়, সেই পরবর্ত্তীকালে উপনিষদকার ব্রাহ্মণগণ অনন্তের ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শাক্যসিংহ চতুর্থ অরূপ ব্রহ্মধ্যানের স্তরে আরোহণ করিয়াও আমিত্ব, অজ্ঞানতৃষ্ণা ও দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইতে পারিলেন না দেখিয়া তিনি বোধিদ্রুম মূলে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার সাধনার স্তরগুলি লোকত্তর নামে অভিহিত, এবং সংখ্যায় প্রধানতঃ নয়টী; যথা—গোত্রভূ, স্রোতাপত্তি মার্গ, স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামী মার্গ, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী মার্গ, অনাগামী ফল, অর্হত্ব মার্গ, অর্হত্ব ফল। চতুর্থ অরূপ ব্রহ্মধ্যান ও স্রোতাপত্তি মার্গ ধ্যানের মধ্যবর্ত্তী অবস্থার নাম গোত্রভূ। যখন গোত্রভূ অতিক্রম করিয়া সাধক পুনরায় সাধনা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাকে স্রোতাপত্তি মার্গস্থ বলা হয়। এই ধ্যানের অবস্থায় সাধক তিনটী জিনিস পরিত্যাগ প্রয়াসী হন; যথা—সৎকায় দৃষ্টি বা আত্মবাদ, বিচিকিৎসা বা সংশয়বাদ, এবং শীলব্রত বা যাগযজ্ঞ, স্নানাদি বৃথা ক্রিয়াকাণ্ড। এই মার্গ ধ্যানপূর্ণ হইলে সাধক স্রোতাপন্ন (নির্ব্বাণ স্রোতে পতিত) হন। স্রোতাপন্ন ব্যক্তির নির্ব্বাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ সৎকায় দৃষ্টি, সংশয় ও শীলব্রত অবশিষ্ট থাকে, তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে প্রেত, অসুর, নারকী, পশু ও পশু পক্ষী প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হত হত্যা প্রভৃতি ছয়টী গুরুতর কার্য্য করিতে পারেন না। তিনি কায় বাক্য কিংবা মনে যে কোন পাপকর্ম্ম করেন, তাহা গোপন করিতে পারেন না, কারণ দর্শনসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে পাপ গোপন অসম্ভব। স্রোতাপত্তি

অবস্থা অতিক্রম করিলে পর সাধক সকৃদাগামী মার্গধ্যানে আরোহণ করেন। এই ধ্যানাবস্থায় সাধক পাপের মূল যথা সাধ্য উৎসন্ন করেন ও এই মার্গ-ধ্যান পূর্ণ হইলেই সাধক সকৃদাগামী নামে অভিহিত হন। তদবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর একবারের অধিক পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সকৃদাগামী অবস্থা অতিক্রম করিলে সাধক অনাগামী মার্গ-ধ্যানে উপনীত হন। এই ধ্যানের অবস্থায় তিনি বিষয়-বাসনা, হিংসা-দ্বেষ, স্ত্যোন-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য, কুকৃত্য ও সংশয় পরিত্যাগ করিতে যত্নবান হয়েন, এবং এই ধ্যান পূর্ণ হইলেই সাধক অনাগামী হন, তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না; নিতান্ত ধরায় আসিতে হইলেও তিনি ঔপপাতিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। অনাগামী অবস্থা অতিক্রম করিলে পর সাধক অর্হত্ব-মার্গ-ধ্যানে আরোহণ করেন। সেই অবস্থায় তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ আলোচনা করেন। এই অবস্থা পূর্ণ হইলেই সাধক অর্হত হন এবং অর্হত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ষড়ভিজ্ঞা, ঋদ্ধি এবং বিদ্যা ও বিমুক্তি আয়ত্ব করেন।

আর্য্যমার্গ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হইল। যিনি এই মার্গপথে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন, তিনিই দুঃখ-নিরোধ করিয়া নির্ব্বাণলাভ করিতে পারিবেন। "নিব্বাণ পচ্চয়ো হোতু"।

শ্রীগুণালঙ্কার মহাস্থবির।

"আর্য্য-ত্রি-লক্ষণ"

সংসার অনিত্য—এই বাক্যটী প্রতিক্ষণে প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধ্বনিত হইলেও, সংসারের কার্য্য-কলাপ দৃষ্টে প্রতীতি হয়, যেন সংসার সুখসুপ্ত মানব-হৃদয়ে কোন প্রকার চৈতন্য সম্পাদনে সমর্থ না হইয়া শুধু শব্দরূপেই মুখে মুখে পর্য্যবসিত হয়। অনিত্য অর্থে—অস্থায়ী, ধ্বংসশীল, মরণশীল, ক্ষণভঙ্গুর; অর্থান্তরে ইহাকে পরিবর্ত্তনশীল বলিলেও বোধ হয় বিধি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে। দুর্দ্দমনীয় কর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এক্ষণে আমরা এক একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই অনিত্যতার অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব। দেখিব, প্রতি ক্ষণে ইহার চিন্তনে মানবের কি প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে?

প্রাণী জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, সমস্ত জীবই কাম মোহোৎপন্ন এবং কাম ও মোহে মত্ত থাকিয়া জগতের সৃষ্টিরক্ষা করিতেছে। এই কাম ও মোহবশেই তাহারা স্ব স্ব পরিবার সৃষ্টিকরতঃ ঊর্ণনাভের ন্যায় স্বরচিত জালে বদ্ধ থাকিয়া চিরকাল জীবন যাপন করিবার জন্য অভিলাষী। কিন্তু জীবনরূপ যবনিকার অন্তরালে যে মৃত্যু রহিয়াছে, তাহা কাহারও আকাঙ্ক্ষিত না হইলেও, দেখা যায় প্রত্যেক জীবই মৃত্যুবশে উক্ত পাশ ছিন্ন করিয়া অনন্তকালের জন্য কোথায় চলিয়া যায়।

মৃত্যু বড়ই ভীষণ! জননীর স্নেহ, পিতার যত্ন, রমণীর ভালবাসা, সেবা-শুশ্রূষা ও প্রেমালিঙ্গন এবং সন্তানের মমতা, প্রতিবেশিগণের প্রীতিসম্ভাষণ ইত্যাদি এক একটী দুশ্ছেদ্য বন্ধন। এই সকল প্রিয়জনের সম্মিলন-স্মৃতি যেমন সুখময়ী, ইহাদের বিচ্ছেদ-স্মৃতিও সেই-রূপ জ্বালাময়ী। প্রাণ ইহাদের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে চায় না। কিন্তু করালকাল এই স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিয়া অদ্য জনককে, কল্য জননীকে, তৎপর দিন ভ্রাতাকে কবলিত করে। হায়! প্রিয়-বিচ্ছেদ কি ভীষণ! কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক! প্রিয়-বিচ্ছেদ ঘটিলে সংসারে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু যাইবে কোথায়? শান্তি কোথায়? তাহাদের বিচ্ছেদে উন্মত্তের ন্যায় ছট্‌ফট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে শান্তি মিলিবে কি? আহা! ঐ দেখ, এত দিন যে ব্যক্তি পরম-সুখে জনক-জননী, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র লইয়া জীবন-যাপন করিতেছিল, আজ মৃত্যু সহসা আসিয়া তাহার সুখের সংসার ছারখার করিয়া দিল। এখন প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ-দুঃখ তাঁহার নিকট শত বৃশ্চিক-দংশন হইতেও অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইল। ইহাতেই বা তাহার যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি কৈ? পরক্ষণে মৃত্যু আসিয়া তাহাকেও যে লইয়া যাইবে। কি প্রকারে তখন এই সাধের গৃহ, আজন্ম-শ্রমলব্ধ সম্পদ, অতি স্নেহের পুত্র-কন্যা কাহার করে সমর্পণ করিয়া যাইবে? হায়! এই সকল স্মৃতি মুমূর্ষু ব্যক্তির পক্ষে কতদূর মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণাদায়ক! আবার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মানবের কল্যাণাকল্যাণ কর্ম্ম-স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া ক্ষণে ভীতি, ক্ষণে প্রীতির আবির্ভাবে তাহাকে কতই না মর্ম্ম-যন্ত্রণা প্রদান করে। রোগযন্ত্রণাপেক্ষা সেই সমুদায় মানসিক যাতনা কত অধিক ক্লেশকর। এই সমুদায় দুঃখ বিপদ জীবের অবশ্যম্ভাবী—সুতরাং বিপদকে ভুলিয়া থাকিলে একদিন অলক্ষিতে মৃত্যু আসিয়া যে যন্ত্রণা প্রদান করিবে, তাহা তোমার অতীব অসহনীয় হইবে। এই হেতু ভগবান্ তথাগত সংসারের যাবতীয় পদার্থ অনিত্য অস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর—সর্ব্বদা এই ভাবনা স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। অনিত্যভাবনা ধীরে ধীরে তোমার মনোমধ্যে এই জ্ঞানের সঞ্চার করিবে যে, তোমার স্নেহময়ী জননী, স্নেহময় পিতা, প্রাণতুল্যা পত্নী, নয়নানন্দ পুত্র, আনন্দাস্পদ আত্মীয়-বর্গ—ইহাদের সকলেই মরণশীল, তখন তাহাদের মৃত্যুজনিত দুঃখ আর তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিতে পারিবে না, কারণ তখন তুমি অনিত্যবাক্যের নিরত অনুস্মরণে, যুদ্ধক্ষেত্রের বীরের ন্যায় সহসা বক্ষ বিস্তার করিয়া দুর্দ্দমনীয় আততায়ী মৃত্যুর আঘাত গ্রহণে প্রস্তুত! তখন মৃত্যুকে তোমার আর ভয় হইবে না; কেবল সর্ব্বদা সেই শত্রুর বিষয় ভাবনা করিয়া সমরে তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য তুমি কম্মরূপ অস্ত্র-শস্ত্র মার্জ্জিত করিতে যত্নবান্ থাকিবে।

অনিত্য—এই বাক্যের ভিতরে বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। উত্তেজিত দুষ্প্রবৃত্তি নিচয় যখন মানবকে বিপথে চালিত করে, তখন এই অনিত্য ভাবনা একবার সম্যক্ জ্ঞানের সহিত স্মৃতিপথে উদিত হইলে, দুষ্প্রবৃত্তি নিচয়ের উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে প্রশমিত হইয়া যায় এবং পর মুহূর্ত্তেই সমগ্র জগতবাসীকে সমদুঃখ-

ভোগী জীবজ্ঞানে অন্তরে সর্ব্বজনীন প্রেম ও কারুণ্যের সঞ্চার হয়। স্বার্থপরতা, চুরি, মিথ্যাভ্যাস, প্রবঞ্চণা, পরদারগমন, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহঙ্কার, অভিমান, কলহ, পরপীড়ন প্রভৃতি নিকৃষ্টশ্রেণীর ভাবগুলি এই অনিত্য ভাবের আবির্ভাবে অন্তর হইতে দূর-দূরান্তর সরিয়া পড়ে। ইহার চিন্তনে কর্ম্মবাদী মানবের ধনের আকাজ্ক্ষা, যশের আকাজ্ক্ষা, রাজ্যবাসনা, সম্ভোগবাসনা প্রভৃতি সমুদায় তৃষ্ণা বিনষ্ট হইয়া যায়। মৃত্যুর ঈষৎ ইঙ্গিতে যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হয়, তবে বহুসংখ্যক মানবের জীবন সংহার দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্যলাভও বৃথা নয় কি? প্রতীতি হয়, যেন মৃত্যুর নিস্তব্ধতা, বিজ্ঞানের বজ্রনির্ঘোষকে সস্মিত উপহাস করে। একের অন্তরে একটি মাত্র বিসম্বাদী প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আজ লক্ষ লক্ষ মানব অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে।

পুরুষ ও প্রকৃতির সম্মিলনে যেরূপ বিশ্বসৃষ্টি কল্পিত হয়, তদ্রূপ অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা জড়িত হইয়া সমর-সৃষ্টিরূপ বিশ্বধ্বংসের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। পরিণাম-চিন্তাবিরহিত স্বার্থপরতায় ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার, পত্নীর প্রতি পতির, জনক-জননীর প্রতি সন্তানের, প্রজার প্রতি রাজার, প্রতিবেশীর প্রতি সম্পাতপন্ন লোকের ব্যবহার যেমন সাতিশয় অপ্রীতি-কর ও অশান্তির আকর হইয়া থাকে এবং এতাদৃশ ব্যবহারে পরস্পরের সৌহৃদ্যবন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, সেইরূপ আবার আত্মদৃষ্টিপূর্ণ অনিত্য ভাবনায় পরার্থপরতা উৎপাদন করিয়া মানব-হৃদয়ে প্রেম ও শান্তির রাজ্য স্থাপন করে। তখন প্রেমময়ী মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার সঞ্চারে সর্ব্বজীবে আপনার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। তখনই মানব মহাসত্ত্ব, তখনই মানব মহাপুরুষ।

তৃষ্ণাজড়িত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মপ্রভাব জীবের জন্মবিধায়ক হইলেও পূর্ব্ব-সংস্কারপ্রসূত বর্ত্তমান কর্ম্ম ও জ্ঞান জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। অবিশ্রান্ত জলপ্রবাহ ক্রমে ক্রমে নদীর প্রসার বৃদ্ধি করিয়া যেমন সমুদ্রে পতিত হয়, তেমন অবিরাম কর্ম্মপ্রবাহও উত্তরোত্তর তৃষ্ণার বৃদ্ধি করিয়া নূতন নূতন অনন্ত জীবনের স্তরে স্তরে মিশিতেছে।

'সর্ব্বজীব আহারে স্থিত'। মানবদেহ অন্নব্যঞ্জনে পুষ্ট। অন্নব্যঞ্জন যদ্রূপ সত্বর পুতিগন্ধে পরিণত হয়, অন্নব্যঞ্জনপুষ্ট দেহও তদ্রূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া পুতিগন্ধে পরিণত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতে সহজে কাহারও প্রতীতি জন্মে বলিয়া মনে হয় না। সহস্র সহস্র মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করিয়া মৃত ব্যক্তির প্রতি স্বতঃই বৃথা সহানুভূতি ও শোকের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু সমবেত জনগণের সংখ্যানিরূপণকারী যদ্রূপ সর্ব্বদা আপনাকে ত্যাগ করিয়া গণনা করে, তদ্রূপ শোকার্ত্ত ব্যক্তি বা দর্শকের দেহেরও যে সেই পরিণতি, এ বিষয়ে তাহার কখনও আত্মদৃষ্টি জন্মে না। ইহাই অবিদ্যা, ইহাই মোহ, ইহাই বিশ্বপ্রপঞ্চ। আত্ম-দৃষ্টির আবির্ভাবই জ্ঞান; ইহাই 'অনিত্য'-জ্ঞান। এই জ্ঞান মনোমধ্যে উদিত হইলে, মৃত ব্যক্তির জন্য শোক ও দুঃখের পরিবর্ত্তে স্বকৃত পাপের অনুতাপে ভীতি ও দুঃখের আবির্ভাব হয়। পরক্ষণে আবার সন্তানের মুখ দর্শন, জননীর মধুর সম্বোধন, ভ্রাতা-

ভগ্নীয় শিরোত্রাণ, বিষয়ের রসাস্বাদন ইত্যাদি সুখভোগ, তৃষ্ণারূপ অমানিশার ঘোর অন্ধকারে জ্ঞানের ক্ষীণ আলোটুকু আচ্ছাদিত না হইলে, ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম ও তৃষ্ণা মার্জ্জিত হয়। তখন মৃত্যু-বিভীষিকা তাহার সংযত মনে কোন ভীতির সঞ্চার করিতে পারে না। আমরা এ বিষয় আরও স্পষ্টতর বুঝিতে চেষ্টা করিব। পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে ষড়ায়তন বলে। এই ষড়ায়তনের সহিত প্রকৃতির সংমিশ্রণে মানব হৃদয়ে কাম ক্রোধ আদি ষড়রিপু এবং স্নেহ, মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, ভয়, ভক্তি, প্রেম, প্রীতি, অনুরক্তি, সহানুভূতি প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তি নিচয় উৎপন্ন হইয়া বিশ্বের সৃষ্টিরক্ষার হেতু হইয়াছে; এই ষড়ায়তন আত্মা নহে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সাধা ও মানস এই ষড়ায়তনের ক্রিয়াগুলিও আত্মা নহে। দেহ আত্মা নহে, অতৃপ্ত বাসনা ও অবিশ্রান্ত কর্ম্ম-প্রবাহই এই ষড়ায়তনবিশিষ্ট দেহের উৎপত্তির একমাত্র কারণ। এই ষড়ায়তন প্রকৃতিসাপেক্ষ, ইন্দ্রিয়ভৌতিক, দেহভৌতিক কিন্তু তৃষ্ণাভৌতিক নহে। ভৌতিক দেহের পতনে তৃষ্ণার বিলয় হয় না। তৃষ্ণার ধ্বংসে কর্ম্মেরও ক্ষয় হয়। অতএব তৃষ্ণা ও কর্ম্ম ঠিক যেন প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধ। তৃষ্ণা কর্তৃক জীব ধৃত হয়, কর্ম্ম তাহার বিধানকর্ত্তা বা বিধাতা।

প্রকৃতির ভৌতিক পদার্থে লুব্ধ তৃষ্ণা কর্ম্ম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। কর্ম্মের গুণাগুণের উপর তৃষ্ণার যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট নানাবিধ জৈবিক দেহের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতিই ইহার উপকরণ প্রদান করে। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান ইহার সহায়তা করে। পৃথিবী তৃষ্ণা-সম্ভোগের স্থান। প্রকৃতি-প্রদত্ত পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্য্যতঃ এ ভোগ সংসাধিত হয়। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ উপায়ে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কল্যাণাকল্যাণ ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। কল্যাণ পুণ্য কর্ম্ম, অকল্যাণ পাপ কর্ম্ম। কর্ম্মের শুভাশুভ ফলতৃষ্ণার উপরই কার্য্যকর হয়। জ্ঞান—তৃষ্ণা ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ করিয়া জন্মের উৎকর্ষ বিষয়ে সাহায্য করে। কর্ম্ম ও তৃষ্ণা সমন্বিত এই ভৌতিক দেহই 'আমি'। জ্ঞান ও বিবেক ইহাতে উৎপন্ন হয়। এই দেহেই দুঃখ সমুদয় সম্ভূত হয়। ভৌতিক দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্মও তৃষ্ণার ধ্বংস বহুক্লেশসাধ্য। কর্ম্ম ও তৃষ্ণার ধ্বংসে দুঃখ সমুদয়ের বিনাশ হয়। কর্ম্ম-তৃষ্ণাবিলোপের পরবর্ত্তী অবস্থাই নির্ব্বাণ।

সচরাচর পার্থিব পদার্থের উপরেই তৃষ্ণার প্রভাব সমধিক প্রবল দৃষ্ট হয়। রমণীর সৌন্দর্য্যে মন মোহিত হইলে প্রথম রূপ, মোহ, বা দর্শনেন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ইন্দ্রিয়নিচয় ভ্রান্তপথে চালিত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের সমর্থন করে। ইন্দ্রিয়নিচয়ের সমবেত যত্নে মনে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়; এইরূপে সুন্দরীর আসঙ্গলিপ্সা বা তাহার প্রতি তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। পূর্ব্বে বা তৎকালে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম তৃষ্ণা-চরিতার্থের সহায়তা করে। কর্ম্মপ্রভাবের ন্যূনতা বশতঃ অতৃপ্ত বাসনা জন্মান্তর অনুসরণ করে। এই তৃষ্ণাই পূর্ব্ব সংস্কারক।

তৃষ্ণা আকর্ষণ মাত্র। সূত্রের একপ্রান্তবদ্ধ ঘুড়ি, বায়ুমণ্ডলে ছাড়িয়া দিয়া সূত্রের অপর

প্রান্ত দ্বারা আকর্ষণ করিলে, ঘুড়ি যেমন আকর্ষণকারীর হস্তে আসিয়া পতিত হয়, তেমনি তৃষ্ণাপীড়িত ব্যক্তিরও স্বাধীনতা নাই। সে সর্ব্বদা তৃষিত বস্তু কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেই অনুরাগী। পৃথিবীর জীব সমূহ তৃষ্ণাপীড়িত। সুতরাং কোন না কোন আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া 'যাব জননং, তাবন্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নং," বিশ্বের এই মহা আবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তনের অধীন থাকিয়া অনন্তকাল এই পৃথিবীতে দুঃখভোগ করিতেছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, জীবসমূহ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, অনন্তজীবন তাহারই জন্য অনুরাগী হয়। উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি মনসংযোগে যে অনুরাগ জন্মে তাহাকে শ্রদ্ধা বলে। পরিশুদ্ধ কর্ম্ম, জ্ঞান ও বিবেক উক্ত শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধন করে। শ্রদ্ধার পোষণে এই দুঃখময় সংসারে কথঞ্চিৎ শান্তি পাওয়া যায়।

অবলম্বন ব্যতিরেকে যেমন বহ্নির অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি সজীব দেহ ব্যতীত তৃষ্ণারও পৃথক্ সত্ত্বা পরিস্ফুট হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পার্থিব জীব—কামমোহোৎপন্ন এই কামজ জীব—প্রত্যেকে কোন না কোন তৃষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়া এই সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রত্যেক জীবের জীবন বিশ্লেষণে দেখিতে পাই, প্রধানতঃ দুইটি তৃষ্ণার তৃপ্তি সাধনে সকলে চেষ্টিত এবং এই চেষ্টা স্বাভাবিক। প্রথমতঃ সৃজন হেতু কামতৃপ্তি, দ্বিতীয়তঃ রক্ষণহেতু ক্ষুন্নিবৃত্তি। প্রকৃত পক্ষে কামই সমস্ত প্রবৃত্তিনিচয়ের উৎপত্তির আদিকারণ। কাম যেরূপ প্রাণীজগতের সহিত বন্ধন স্থাপন করে, বুভুক্ষুও সেইরূপ ভৌতিক জগতের সহিত সংস্রব স্থাপন করে। এইরূপে প্রাণী ও ভৌতিক জগতের সংস্পর্শে মায়ার উৎপত্তি হয়। মায়া বা তৃষ্ণা প্রায় একার্থবোধক। জীবগণ পাশবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পাশসহ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে বৃথা চেষ্টা করিয়া পুনঃ সংসারে পতিত হয়। পরিবার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বহুপাশে জড়িত হয়। পরিবারসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আবার দুঃখের ধারাবাহিক উৎপত্তি অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

আত্মশব্দ অর্থে যাহা আমরা বুঝিতে পারি, অনাত্ম শব্দটি ঠিক তাহার বিপরীত। আমি আমার নহি, অথচ পক্ষান্তরে আমি জীব-জগতের সকলেরই। সকলের ভিতরে আমার আমিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বজীবে এ আমিত্বানুভূতিই ব্রহ্মবিহার। সুকৃতি যেমন জন্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়া রাজকুলে জন্মিবার কারণ হয়, দুষ্কৃতিও তদ্রূপ অপকৃষ্ট জন্মসাধনের কারণ। মানব এই সুকৃতি দুষ্কৃতির অধীন। জন্মান্তর-রহস্যানভিজ্ঞ ব্যক্তি জন্মচক্রে সংখ্যাতীত যোনি পরিভ্রমণ করিয়া সংখ্যাতীত জীবের সহিত তাহার বর্ত্তমান বা জন্মান্তরীন শোণিত-সংস্রব করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। এই হেতু পৃথিবী রহস্যময়ী। জ্ঞানের দ্বারা এই রহস্য উদ্ঘাটিত হইলে হিংসা বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। সমগ্র পৃথিবীই তাহার পরিবার; পৃথিবীর জীবনগণের সহিত হয়ত তাহার জনক-জননী, ভ্রাতা-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্র, পতি-পত্নী ইত্যাদি জন্মান্তরীন নানাবিধ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। সরসীর জলকণিকা যদ্রূপ বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পুনঃ বৃষ্টিরূপে কখন নদীতে, কখন নালায়, কখন সরসীতে,

সমুদ্রে অথবা স্থলভাগে পতিত হয়, জীবও তদ্রূপ জন্মরূপ কত অসংখ্য নদী নালার ভিতর দিয়া এই বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সুতরাং এই পার্থিব জীবসমূহ প্রকারান্তরে আমারই অংশভূত, পরন্তু আমি আমার নাই। এই জ্ঞানের আবির্ভাবে বিশ্বজনীন প্রেম ও শান্তির আবির্ভাব হয়।

সৎকর্ম্ম যেমন মানবকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে আপনার করিয়া লয়, দুষ্কর্ম্ম তেমনি অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর বিদ্বেষ-বহ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

ঋষিগণ বলিয়া থাকেন—

অয়ং নিজ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

জ্ঞানের অভির্ভাব ব্যতিরেকে অদৃষ্টপূর্ব্ব দূরবর্ত্তী স্থান বা বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা সর্ব্বদা সংশয়ব্যঞ্জক। উপযুক্ত সূক্ষ্মদর্শনের অভাবে আমরা অবিরল আত্মপর-ভেদজ্ঞান সৃষ্টি করিতেছি, কিন্তু উদারচরিত জ্ঞানিগণ, জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শনের প্রভাবে সমস্ত বসুধা বা বসুধাবাসী জীবগণকে তাঁহাদের আত্মীয়রূপে দেখিতে পান। এই হেতু মহাকারুণিক ভগবান্, সম্যক্ সম্বুদ্ধ, শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবের মঙ্গল কামনা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। এই মৈত্রী ভাবনায় মনকে প্রত্যেক উচ্চারিত শব্দের ভাবের সহিত যখন প্রত্যেক জীবের স্তরে স্তরে চালিত করে, তখন মনে কতই বিমল আনন্দের সঞ্চার হয়—শুধু পৃথিবী কেন, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার আমিত্বানুভূতি স্পষ্ট প্রকটিত হয়।

শ্রীগজেন্দ্রলাল চৌধুরী।

বৌদ্ধধর্ম্মে আত্মবাদ

আমি কে? আমার আমিত্ব কোথায়?

আমরা যে বলি, 'এই আমি', 'ইহা আমার'; জগতের সকলের সহিত আমার স্বাতন্ত্র্য এই-খানে—ইহার পশ্চাতে যে প্রতীতি, যে সংস্কার, তাহার মূল কোথায়?

মানুষ যে দিন প্রথম ভাবিতে শিখিল, সেই দিনই তাহার সকল কর্ম্মের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিল, এই এক চিন্তা, এক সমস্যা—'কোঽহম্'—আমি কে?

এই যে দেহ, ইহাই কি আমি?—না ইহার পশ্চাতে একটা সত্তা আছে, তার এই দেহ; ইহার কোনটি আমি?

এই সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া, কত ঋষি, কত দার্শনিক, কত দীর্ঘ বৎসর তপস্যায়

কাটাইয়াছেন, তবুও ইহার মীমাংসা হইল না—তথাপি সেই একই প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠে—'কোঽহম'।

কবি (Mystic) কল্পনানেত্রে দেখিলেন, এই চিরপরিবর্ত্তনশীল চঞ্চল জীবনপ্রবাহের অন্তরালে লুক্কায়িত এক অজর, অমর আত্মা! আর প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক, বাস্তবের কঠোর করস্পর্শে, তার সকল কল্পনা, সকল স্বপ্ন উড়াইয়া দিল!

'কোঽহম' লইয়া বাদ-প্রতিবাদ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে—ঋষিগণও এই সমস্যার শেষ মীমাংসা করিতে পারেন নাই। পুরাতন সমস্যাগুলি যেমন এক এক করিয়া ঝরিয়া পড়িতে থাকিল, অমনই তার স্থানে নূতন সমস্যা ও সংশয় জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

কেহ বলিলেন—আত্মা আছে, কেহ বলিলেন—নাই! এই দুই অন্ত (Extreme) হইতে ঋষিগণ তর্ক করিতে লাগিলেন, তাই তাঁদের বিরোধ-বৈষম্যের সমাধান হইল না।

ভগবান্ বুদ্ধদেব নূতন সামঞ্জস্যের দ্বারা এই বিরোধের সমাধান করিয়াছেন। তিনি শ্রুতির নিত্য, অজর, অমর, পাপপুণ্যের অতীত আত্মা স্বীকার করেন নাই, নাস্তিবাদও অস্বীকার করিয়াছেন।

রাজা বিম্বিসারকে তিনি যে উত্তর দেন, তাহা হইতেও ইহা বুঝা যাইবে—

"যদি মৃত্যুর পর 'আমি' ধ্বংস পায়, কর্ম্মের ফলও ধ্বংস হইয়া যাইবে, সুতরাং বিনা পুণ্যেই মুক্তিলাভ হইল।

আর যদি 'আমি' ধ্বংস না পায়, 'আমি' চিরকাল সমানই রহিল; তাহা হইলে মুক্তির চেষ্টার কোনও প্রয়োজন নাই, কেননা অপরিবর্ত্তনীয়ের পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বৃথা।"

বৌদ্ধধর্ম্মের মতে আত্মা কি?

যখন একজন ভিক্ষু ধম্মদিন্না স্থবিরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকে বলে 'আত্মা—আত্মা' কিন্তু তৎসম্বন্ধে ভগবান্ কি বলিয়াছেন?"

স্থবিরা উত্তর দিলেন, "ভগবান্ বলিয়াছেন—"আত্মা পঞ্চ স্কন্ধে গঠিত।"

রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই পাঁচটিকে পঞ্চ স্কন্ধ বলে।

তা' হ'লে আত্মা, দেহের অতীত কোনও সত্তা নয়,—এই পাঁচটিই হইল আত্মা।

পঞ্চ স্কন্ধের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও রূপ এই পাঁচটি স্কন্ধ। ইহার মধ্যে প্রথম চারিটির সমষ্টি হইতেছে নাম, আর বাকী যাহা তাহাই রূপ।

নাগসেন ইহাদের সংজ্ঞা দিয়াছেন—"যাহা স্থূল, তাহা রূপ, এবং যাহা সূক্ষ্ম, তাহা নাম; তাহারা পরস্পর সহযোগী ধর্ম্ম, এবং উভয়ে মিলিত হইলেই সত্তা উৎপাদনে সমর্থ হয়—ইহাই তাহাদের চিরন্তন প্রকৃতি। (মিলিন্দ প্রশ্ন)

তা'হ'লে রূপ—দৈহিক ধর্ম্মের সমষ্টি, আর নাম—মানসিক ধর্ম্মের সমষ্টি।

ইহার মধ্যে নাম দুই চক্ষু অন্ধ, আর রূপ খোঁড়া; তা'র মধ্যে নাম বা মন আছে বলিয়াই সে সজীব—তা'র অন্তরে মন আছে বলিয়াই তা'র প্রাণশক্তির পরিচয় নাই।

রূপ জড় ও নাম চৈতন্য। নাম ও রূপ এই উভয়ের সম্মিলনে—'আমি'র আবির্ভাব।

নাম অভাবে রূপ যেরূপ কার্য্যাক্ষম, রূপ অভাবেও নাম তদ্রূপ অচল; নাম ও রূপ দুই মিলিয়াই আত্মা।

তা'হ'লে এই আত্মা হইল দৈহিক ও মানসিক উপাদান সমূহের সর্ব্বতোভাবের বিকাশ।

যেমন বায়স্কোপের ফিলম্ (film); একটি ফিল্মে কত ছবি আছে—প্রত্যেকটি বিভিন্ন—কিন্তু যখন দেখান হয়, তখন আমরা আর এক এক খানি বিভিন্ন ছবি দেখি না। দেখি কি?—সেই সকল চিত্রের সর্ব্বতোভাবের অভিব্যক্তি।

আবার ইহা কিরূপ?—না, যেমন আমাদের বাড়ী;—দেয়াল আছে, ছাদ আছে, জানালা আছে। এখন যদি এই বাড়ীর ছাদ বা দেয়ালটা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, তা'হ'লে তখন আর সেই গৃহের গৃহত্ব থাকিবে কি? গৃহও তাহ'লে হইল—তা'র অঙ্গসমূহের মিলনের ফল।

যা'কে ইংরাজীতে বলে—"Impression of the play"—এই আত্মা অনেকটা সেই-রূপ। অভিনয় হইতেছে, প্রত্যেক অভিনেতা বিভিন্ন অংশ অভিনয় করিতেছে, প্রত্যেক চরিত্র বিভিন্ন, অথচ সেই নাটকখানি শুনিতে শুনিতে তার সর্ব্বতোভাবজনিত যে একটি ধারণা জন্মে, তাহার এই আত্মার সহিত তুলনা হইতে পারে।

সাত বর্ণের এক খানি গোল চাকা যদি খুব জোরে ঘুরান যায়, তা'হ'লে সাতবর্ণ এক সঙ্গে মিশিয়া চক্ষের সাম্নে সাদা রঙ্গের সৃজন করে! পঞ্চ স্কন্ধের মিলনজনিত আত্মাও অনেকটা সেইরূপ।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহের সহিতও এই আত্মবাদের মিল আছে। অধ্যাপক Fitchener তাঁহার Outlines of Psychology নামক গ্রন্থে বলেন,—জীবন কয়েকটি জটিল দৈহিক ও রাসায়নিক ধর্ম্মের সাধারণ নাম মাত্র; ইহা এই দুই ধর্ম্মের অতিরিক্ত বা বহির্ভূত অলৌকিক সত্ত্ব নহে। অতএব আমরা আর মনকে মানসিক ধর্ম্মের অতীত একটা কিছু, এবং মেধা, অনুভব ও ইচ্ছাকে মনঃবৃত্তি বলিয়া মনে করি না। মন মানসিক ধর্ম্মের সমষ্টি এবং মেধা, অনুভব ও ইচ্ছা এই ধর্ম্মসমষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ।"

আত্মা তা'হ'লে পরিবর্ত্তনশীল আকারের পশ্চাতে একটা প্রচ্ছন্ন অজ্ঞেয় পদার্থ নয়; বরং যে সব ভাব ও চিন্তাসমূহে জীবন গঠিত, সেই সকলের বিকাশ—আত্মচৈতন্যের অবস্থা-সমূহের সমষ্টিই এই 'আমি'।

এখন কয়েকটি আপত্তি উঠিতে পারে,—(১) প্রথম আপত্তি এই যে, নাম ও রূপের সমষ্টি হইল আত্মা, অথচ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার প্রভৃতিকে বলা হইতেছে—সমষ্টির ফল! ফলে ইহারা আত্মার উপাদান বা অংশ কেমন করিয়া হইল?

এখানে যত ভুলের উৎপত্তি হইয়াছে, এই 'অংশ' কথাটির ব্যবহারে। স্কন্ধগুলি আত্মার অংশ নয়—স্তর, উন্নতির ক্রম!

চেয়ার টেবিলের মতন জড় পদার্থের বর্ণনায় আমরা তার অংশের কথা বলিতে পারি, কিন্তু এখানে নয়। দীপশিখার দাহ প্রক্রিয়াকে আমরা কখনও সমান অংশে বা ভাগে বিভক্ত করিতে পারি না। জড় পদার্থের বেলাই শুধু 'অংশ' কথা ব্যবহার করা চলে, উন্নতিশীল সজীব পদার্থের বেলায় চলে না।

বুদ্ধ তাই অগ্নিশিখার সঙ্গে আত্মার তুলনা করিয়াছেন--কর্ম্মের অগ্নিতে, তৃষ্ণার অগ্নিতে মানুষ জ্বলিতেছে—তাই আত্মার বিকাশ। (মহাবগ্‌গ ১।৪)

অগ্নিশিখার বেলায় যেমন বাতির মধ্যে নিহিত অব্যক্ত শক্তি (Potential energy) অগ্নি-রূপে (Living energy) প্রকাশিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, আবার পরক্ষণেই নূতন শক্তি আত্মপ্রকাশ করে। আত্মার বেলাও সেইরূপ একই প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বহির্জগতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ হইলেই, তার অন্তর্নিহিত শক্তি বিজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রত্যেক প্রকাশের ফলে আবার নূতন শক্তির আবির্ভাব—যাকে ইংরাজীতে বলে Self-changing, অনেকটা সেইরূপ।

এই যে বিজ্ঞান-প্রবাহ, ইহাই 'আমির' দাঁড়াইবার স্থান—ইহাকে আশ্রয় করিয়াই আত্মার প্রকাশ।

Hume (হিউম) প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও অনেকটা এই মতাবলম্বী; কিন্তু তাঁদের প্রধান ভুল এই যে, তাঁরা নাম ও রূপকে আত্মার অংশ বলিয়া মনে করেন। তাই তাঁর বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই। অনেকে Cerebral Cortex এ বিজ্ঞানের স্থান (Seat of consciousness) দেখাইয়া দেন; কিন্তু তাঁদের মত যে সত্য, তাহা প্রমাণিত হইবার কোন উপায় নাই—এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হইয়াছে, তাহার ফল যাহা কিছু জানা গিয়াছে, সকলই Negative Phenomenon মাত্র; তাহা হইতে ইহাই যে বিজ্ঞানের স্থান, তাহার প্রমাণ হয় না। আর প্রমাণ কেমন করিয়াই বা হইবে? আমার, পকেটে সিকি, দুয়ানি, টাকা থাকিতে পারে, কিন্তু দেহের মধ্যে বিজ্ঞানের বিশেষ স্থান (Seat) থাকিতে পারে না। জ্বরগ্রস্ত রোগীর দেহে যেমন তাপের নির্দ্দিষ্ট স্থান (Seat of heat) বাহির করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র, ইহাও সেরূপ।

কর্ম্ম হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি, কর্ম্মের পরিণতি বিজ্ঞান।

আমার চলা, ফেরা, ভাবা, শুধু আমার দেহের Functions নয়, ইহারাই আমি! কর্ম্ম শুধু আমার নয়—কর্ম্মই আমি। আত্মা অভিজ্ঞতার ফল, ইহা বুঝিলেই বৌদ্ধধর্ম্মের আত্মবাদ বুঝা যাইবে।

(২) তার পর আত্মা যদি অগ্নিশিখা বা জল-প্রবাহের ন্যায় হয়; পূর্ব্বের যে জল এখন আর তাহা ত নাই, নূতন জল তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে—শিখার সত্তাও প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অথচ অদ্যকার 'আমি' গত কল্যের 'আমি'র সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল কেন ভোগ করিবে? তার উত্তর—এখন যে বীজ বপন করিয়াছে, পরে তাহার ফলভোগী

হইবে, এমন কোনও স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব নাই ; অথচ অন্য কেহ যে তার ফলভোগ করিবে, তাহাও নয়। তবে এই ফলভোগ করিবে কে ?—পূর্ব্ব আত্মার পরিণাম, পরিবর্ত্তিত আত্মা পরবর্ত্তী আত্মা, পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মার প্রতিনিধি মাত্র।

আজ যে বালিকা, কাল সে যুবতী, যুবতী আবার বৃদ্ধা হইবে: কিন্তু যে কোষসমূহ বালিকার দেহ গঠন করিয়াছিল, এখন আর তাহা নাই ; অথচ বাল্যের বা যৌবনের কর্ম্মফল বার্দ্ধক্যে ভোগ করিতে হইবে কেন ?—না, অন্তকার দেহ পূর্ব্বের দেহের প্রতিনিধি! ইহাও সেইরূপ।

বৌদ্ধধর্ম্ম এই পরিবর্ত্তনের দিক্ দিয়া আত্মাকে বুঝাইয়াছেন ; বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে হইলে, এই প্রবাহের উপমা বুঝিতে হইবে।

পরিবর্ত্তনই স্বভাবের নিয়ম ; আজ যেখানে সমুদ্র, কাল সেখানে হয় ত পর্ব্বতরাজি শোভা পাইবে, আবার কত মহাদেশ সাগরের গর্ভে বিলীন হইবে।

মানব-জীবনেরও নিয়ত পরিবর্ত্তন ; শিশু বালক হইবে, বালক যুবক হইবে, যুবক আবার বার্দ্ধক্যে উপনীত হইবে।

এই চিরপরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির পানে চাহিয়া বৈদান্তিক বা Absolutist বলিবেন—জগৎ মিথ্যা, জীবাত্মা মিথ্যা –ভ্রম মায়া!

আর এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে বুদ্ধ কি দেখিলেন ? তিনি দেখিলেন,—তার মধ্যে একটা প্রবাহ, শুধু একটা গতি।

আবার জগতে দুইটি জিনিস, দুইটি অবস্থা কখনও সমান হয় না—কারণ তাহা যে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছে। ক=ক, ইহাদের যে আমরা সমান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, সে শুধু আমাদের সুবিধার জন্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা অসমান। আজকার দিন ঠিক গত-দিবসের ন্যায়—এ কথায় শুধু ইহাই বুঝায় যে আজ জল-বায়ুর অবস্থা যেমন, গত দিবস অনেকটা সেইরূপ ছিল। একটি ঘটনাকে আর একটির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, তথাপি তাদের মধ্যে কত পার্থক্য, কেননা এখন তার পরিপার্শ্বিক অবস্থা পৃথক্। অতএব আমরা বলিতে পারি না ক=ক ; বলিতে হইবে—

$$ক=\frac{ক}{খ}=\frac{ক}{গ}=\frac{ক}{ঘ}=\cdots\cdots\cdots=ক^{\circ} ;$$

পার্থক্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে।

কিন্তু তথাপি তাদের সমান বলিয়া মনে হয়। বায়স্কোপের ছবিতে যদি বালকের চিত্র দেখাইয়া পরক্ষণেই তার বার্দ্ধক্যের আলেখ্য দেখান হয়, তা'হলে কেহ বুঝিতে পারিবে না, উভয়ই এক লোকের চিত্র! কিন্তু যদি তার সমস্ত জীবন অখণ্ড ভাবে দেখান হয়, তা' হ'লে তার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না ; সে

পরিবর্ত্তন এতই ধীরে ধীরে হইতেছে।

আমাদের আত্মাও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আপনাকে সৃষ্টি করিতে করিতে চলিয়াছে—ভবিষ্যতের হাতে আপনার নিত্য নূতন কলেবর দান করিতে করিতে ছুটিয়াছে।

কিন্তু পরিবর্ত্তনও এত ধীরে এত নীরবে হয় যে, তাহা আমরা ধরিতে পারি না।

অতীতে আমি যে সব কার্য্য করিয়াছি, যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, সেই সব 'আমি' র ছবিকে এখনও আমরা বলিয়া থাকি—'আমার'। আমাদের পূর্ব্বের সকল অভিজ্ঞতা, সকল সংস্কার তাহার মধ্যে চলিয়া আসে।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Henry Bergson এর মতও ইহার সমর্থন করে; তার সহিত বৌদ্ধেরাও বলিতে পারেন—Memory is not faculty for registering souvenirs..............
.........there is no register, nor strictly speaking any faculty.........the heaping up of the past on the past goes on without intermission............
.........following us at every moment which goes merging into it, pressing aganist the gate of consciousness, which would bear it without,............

তাই পূর্ব্বের 'আমি' যদিও ঠিক এখনকার আমি নই, তবু এখনকার 'আমি' পূর্ব্বের 'আমি'র পরিণতি—তার উত্তরাধিকারী।

Leibnitzও ঠিক এই কথা বলেন—

"The present is pregnant with the future, for every phase of existence is a necessary outcome or evolution of what preceded it and bears in it the seed of the future"

গ্রীক-দার্শনিক Platoর মতও অনেকটা এইরূপ। কিন্তু এখানে একটি কথা উঠিতে পারে, পূর্ব্বজন্মের সংস্কার যদি আমার এজন্মেও আসিল, তবে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি এখন থাকিবে না কেন?

বুদ্ধ বলেন—থাকে, তবে স্মৃতির উপর স্মৃতিস্তূপ পড়ায়, পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি চাপা পড়িয়া যায়। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার জানিতে হইলে প্রথমে ইহজন্মের সকল সংস্কার নিরুদ্ধ করিতে হইবে। পাশের ঘরের আলো ঘুলঘুলি দিয়া নিজের ঘরে ফেলিতে হইলে, যেমন আগে নিজের আলো নিবাইতে হয়, ইহা বোধ হয় সেইরূপ।

পূর্ব্বজন্মের আত্মার পরিণতি যখন হইল ইহ জন্মের আত্মা—পূর্ব্বের 'আমি'র উত্তরাধিকারী এখনকার 'আমি'; তখন পূর্ব্বের কৃত পাপপূণ্য আমাকেই ত ভোগ করিতে হইবে।

নাম ও রূপ জন্মান্তর গ্রহণ করে শুনিয়া, মিলিন্দও এই কথা তুলিয়াছেন :—

"একই নাম ও রূপ কি জন্মান্তর গ্রহণ করে?"

"না মহারাজ! তাহা নয়, কিন্তু এই নাম ও রূপ পাপকর্ম্ম করিয়াছে, আর সেই কর্ম্মফলে অন্য নাম ও রূপ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।"

"যদি সেই একই নাম ও রূপ না হয়, তা' হ'লে একটি কি অন্যের পাপের ফল হইতে মুক্ত হইবে না?"

স্থবির উত্তর দিলেন, "যদি পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ না করিত, তা'হলে পাপের ফল হইতে মুক্ত হইত; কিন্তু যখন ইহা পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে তখন মুক্ত নয়।

"উদাহরণ দিন"।

"মনে করুন, মহারাজ, কোনও লোক অন্য এক ব্যক্তির আম চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে; এমন সময়ে যার আম, সে ইহা দেখিতে পাইয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিল। এখন সেই চোর যদি বলে, মহারাজ, আমি এই ব্যক্তির আম লই নাই—এ যে আম বপন করিয়াছিল, তাহা আমি লই নাই; তাহ'লে কি সে দায়ী নয়?"

"হাঁ, দোষী।"

"কি কারণে?"

"সে যাহাই বলুক না কেন, সে স্বীকার করিতেছে পূর্ব্বের আম, আর এই আম তার ফল।"

"সেইরূপ মহারাজ! কেহ যদি এই নাম ও রূপে থাকিয়া কোন ভাল বা মন্দ কর্ম্ম করে, এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তা' হ'লে সে পাপের ফল হইতে মুক্ত হইবে না।"

"আবার—মনে করুন মহারাজ, কোনও ব্যক্তি এক পাত্র দুগ্ধ কিনিয়া, বিক্রেতার নিকট তাহা পর দিবস পর্য্যন্ত রাখিয়া গেল; ইতিমধ্যে ইহা অম্ল হইয়া গেল। সে যদি ইহার জন্য দাবি করিতে আসিয়া বলে,—'আমি তোমার কাছে দধি কিনি নাই, আমায় একপাত্র দুগ্ধ দাও," এবং যদি তারা বিবাদ করিতে করিতে আপনার নিকট বিচারের জন্য আসে, তখন আপনি কিরূপ মীমাংসা করিবেন?"

"গোয়ালার পক্ষে।"

"কেন?"

"কারণ সে যাহাই বলুক না কেন, দুগ্ধ হইতেই দধি উৎপন্ন হইয়াছে।"

"ঠিক সেইরূপ মহারাজ, এক নাম ও রূপ মরণের পর লুপ্ত হইয়া যায়, অন্য জন্মগ্রহণ করে, তবু এই নাম ও রূপ পূর্ব্বের নাম ও রূপ হইতে উৎপন্ন, তাই তার পাপ কর্ম্মের ফল হইতে মুক্তিলাভ করে না।"

নাগসেনের কথায় ইহা সেও নয়, অন্যও নয়। 'সেও নয়', কেননা তার মধ্যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে; আর অন্যও নহে—কারণ এখনকার এই আত্মা, পূর্ব্বের আত্মারই প্রতিনিধি।

এই কথাই যখন মিলিন্দ তুলেন, তখন নাগসেন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ! আপনি কি মনে করেন, যখন আপনি শিশু, নবীন, ক্ষুদ্র ও উত্তানশায়ী ছিলেন, তখনকার আপনিই কি এখন বৃহৎ?

"না ভদন্ত! সেই শিশু, নবীন ও উত্তানশায়ী, অন্য, আর এই বৃহৎ আমি অন্য।"

"মহারাজ! ইহাই যদি হয়, তবে মাতা কেহ হইবে না, পিতাও কেহ হইবে না,

আচার্য্যও কেহ হইবে না, শিল্পীও হইবে না। তবে কি মহারাজ, ভ্রূণের প্রথমাবস্থায় (কললের) মাতা অন্য, দ্বিতীয়াবস্থায় (অর্ব্বুদের) মাতা অন্য, তৃতীয়াবস্থায় (পেসির) মাতা অন্য ও চতুর্থাবস্থায় (ঘণের) মাতা অন্য ? ক্ষুদ্রের মাতা অন্য ও বৃহতের মাতা অন্য ? অন্য-ব্যক্তি শিক্ষা করে, আর অন্য ব্যক্তি শিক্ষিত হয় ? অন্য ব্যক্তি পাপকর্ম্ম করে, আর অন্য ব্যক্তির হস্তপদ ছিন্ন হয়।"

"না ভদন্ত ! কিন্তু আপনাকে ইহা বলিলে, আপনি কি বলিবেন ?"

স্থবির বলিলেন—"আমি বালক, আমিই শিশু, নবীন ও উত্তানশায়ী ছিলাম, এবং আমিই এখন বৃহৎ। এই (ভ্রূণের প্রথমাবস্থার) শরীরকে আশ্রয় করিয়াই এই সকল একত্রিত হইয়াছে।"

সেই ভ্রূণের উত্তরাধিকারী এই দেহ—পূর্ব্ব আত্মার পরিণতি এখনকার আত্মা ; অতএব ভ্রূণের ব্যাধি যেমন পরিণত দেহে সংক্রামিত হয়, পূর্ব্ব আত্মার পাপের ফলও তেমনই পরিবর্ত্তিত আত্মাকে ভোগ করিতে হইবে।

তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন,—"জীব তার কর্ম্মের অধিকারী, তার কর্ম্মের দায়াদ ; কর্ম্মই তার গর্ভাশয়, কর্ম্মই তার কুল, কর্ম্মেই তার গতি।

"বীজ বপন করা হইয়াছে, তার ফলের আস্বাদন তুমিই করিবে", অন্য কেহ নহে !

(৩) তৃতীয় আপত্তি,—আত্মা বলিয়া কোনও পৃথক সত্তা নাই, অথচ জন্মান্তর গ্রহণ কেমন করিয়া দেহান্তরে যাইতে পারে ?

এই জন্মের আত্মাই যে পরজন্মের আত্মা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। কিন্তু নাগসেন যে বলিয়াছেন, "ইহা সেও নয়, অন্যও নয়" তার অর্থ এই যে, ইহা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছে—এই আত্মা শ্রুতির Absolute definite something নয় !

কিন্তু প্রশ্ন এই—সেই Absoluto definite নয়, এমন যে আত্মা, তাহা কেমন করিয়া জন্ম হইতে জন্মান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় ?

আমরা সংবাদপত্রে একবার দেখিয়াছিলাম "The American heatwave has passed over to Europe" অর্থাৎ আমেরিকা হইতে একটি তাপ প্রবাহ ইউরোপে গিয়াছে। এখানে, 'তাপপ্রবাহ গিয়াছে', বলিলে ইহা বুঝায় কি যে, কোন নির্দ্দিষ্ট সত্তা আমেরিকা হইতে ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে ? ইহাতে শুধু বুঝায় যে, শক্তিপ্রবাহ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাপরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছে।

সেইরূপ আত্মা জন্মান্তরে গমন করে, ইহার অর্থ, আমার কর্ম্মপ্রবাহ যাহার পরিণামে আমার আমিত্ব, তাহাই কোন স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কর্ম্ম আমাদের Inforce বা Energy—এই কর্ম্মেই আমাদের ব্যক্তিত্ব—এই কর্ম্মের পরিণাম পঞ্চস্কন্ধই জন্মান্তর গ্রহণ করে।

(৪) চতুর্থ আপত্তি—বিজ্ঞানের দিক দিয়া পুনর্জ্জন্মেরই বিপক্ষে।

বিজ্ঞান বলেন—পিতৃদেহস্থ পুংকোষ ও মাতৃদেহস্থ স্ত্রীকোষ ইহাদের মিশ্রণে মিশ্রকোষের উৎপত্তি। তাহা হইলে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ স্বীকার করিতে হইলে বলিতে হয়, আত্মা, জন্মের পূর্ব্বে মাতা ও পিতা উভয়ের মধ্যে বিভক্তাকারে প্রবেশ করিয়াছিল ; ইহা কিরূপে সম্ভবপর ?

ইহার উত্তর—আত্মা বিভক্তাকারে প্রবেশ করে না, মিশ্রকোষে প্রবেশ করে। পিতামাতার মিলনে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা প্রাণ-হীন। তাহা শুধু নূতন জীবনের আধার বা কাঠামো ; তাহাকে আশ্রয় করিয়া নাম ও রূপ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ফোয়ারাকে আশ্রয় করিয়া যেমন জল উপরে উঠে, আত্মাও সেইরূপ, এই মিশ্রণ সাহায্যে ক্রমোন্নতির পথে ছুটিয়া চলে ! তাপপ্রবাহ বা Heatwave যেমন যাইতে যাইতে এক স্থানের বাতাসকে আশ্রয় করিয়া দেখা দেয়, ইহাও সেইরূপ।

তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন—মানুষ কর্ম্মযোনি, কর্ম্মই তাহার কুল ; পিতামাতা নয়—পূর্ব্ব পুরুষ নয় !

(৫) অনেকে আবার বলেন—বিজ্ঞান যদি আত্মার অন্যতম স্কন্ধ হইল, তাহা হইলে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান আমাদের কিরূপে হইতে পারে ?

বৌদ্ধধর্ম্মের বিপক্ষে শঙ্করাচার্য্যের ইহাই প্রধান যুক্তি ; তিনি বলেন, চক্ষু কখনও চক্ষুকে দেখিতে পায় না, বিষয় থাকিলে বিষয়ীও থাকিবে, অতএব পৃথক্ আত্মা আছে !

বৌদ্ধধর্ম্মের মত কিন্তু তাহা নহে ; আমি'র দিক দিয়া দেখিলে, বিষয়ীর অতিরিক্ত বিষয় নাই ! কেননা বহির্জগতই যে আমার 'আমি' শিখার আহুতি বা উপাদান যোগায়—ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শেই আমার আমিত্বের উৎপত্তি। আমি যাহা করিতেছি, তাহাই আমি, কাজেই আমি আবার কাহাকে দেখিব—দেখিবার বিষয় কোথায় পাইব ?

অবশ্য এখানে মনে রাখিতে হইবে, 'আমি'র দিক দিয়া দেখিতে গেলেই বিষয়ের অস্তিত্ব নাই।

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়।

জন্ম-মৃত্যু কি ?

কবির উক্তি, "জন্মিলে অবশ্য তার হইবে মরণ।" জন্মগ্রহণ করিলে তার মৃত্যু অনিবার্য্য, কিন্তু জন্ম-মৃত্যু কি, এবং পরকাল আছে কি না, এই সকল তত্ত্ব যেমন দুর্জ্ঞেয় রহস্য জালে আবৃত, তদ্রূপ আর কিছুই নহে। তবে আমার মনে হয়, আমাদিগের পূর্ব্বতম ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা এ সম্বন্ধে যতদূর আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত কম বা ঐ সকল রহস্য জাল ভেদ করিতে এক কালে অসমর্থ নহে। আমাদিগের সম্বল তাঁহাদিগের উপদেশ। এই উপদেশ আপ্তোপদেশ নামে অভিহিত। ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে সকল প্রমাণের

শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আপ্তোপদেশ। বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়াদির দোষে প্রত্যক্ষের তারতম্য হইতে পারে, অনুমানের ব্যভিচার ঘটিতে পারে, কিন্তু আপ্ত প্রমাণ কোনরূপেই ব্যর্থ হইতে পারে না। যে সকল মনীষী আধ্যাত্মিক সাধনা-বলে পার্থিব ভ্রম-প্রমাদাদি অতিক্রম করিয়া সেই অক্ষয় অমৃত জ্ঞানের রাজ্যে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, মর্ত্ত্যের মানব-বৃন্দের হিতের নিমিত্ত তাঁহারা যে সকল অমৃতময় উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আপ্তোপদেশ নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল তত্ত্ব সাধনলভ্য, সর্ব্বাংশে প্রত্যক্ষ বা অনুমানগম্য নহে। আপ্ত-প্রমাণ সম্বন্ধে সর্ব্ব-প্রধান যুক্তি এই—এই সকল তত্ত্বের যাঁহারা সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন; এবং সাধারণতঃ যতদূর দেখা যায়, আপ্তবাণী কোথাও মিথ্যা হয় না, অতএব আপ্ত প্রমাণ মিথ্যা হইতে পারে না।

("শ্রুত্যাসিদ্ধস্য নাপলাপস্তৎ প্রত্যক্ষ বাধাৎ।" ১।১৪৭ সাংখ্য)

তবে একটা কথা আছে, কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, বা আপ্তোপদেশ অভ্রান্ত বলিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, আমরা শাস্ত্র বা আপ্তোপদেশের মর্ম্ম কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব না। আমরা যদি কায়মনোবাক্যে শাস্ত্রোপদেশ বা আপ্তোপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিজেরা ঋষিদিগের ন্যায় রজস্তমোগুণমুক্ত হইবার চেষ্টা করি, তবেই ঋষিদিগের ন্যায় ত্রিকালজ্ঞ ও জন্মমৃত্যু, পরকাল, পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতির গভীর রহস্যজাল ভেদ করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। কিন্তু যতদিন না আমরা তদ্রূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি, ততদিন যেন ঋষিবাক্যে আস্থা প্রদর্শন এবং ঋষি-বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করি।

আমাদিগের উপনিষদ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে জন্ম-মৃত্যু জীবের অবস্থান্তর বলিয়া কথিত হইয়াছে। অবস্থান্তর শব্দে গুণের তারতম্য বুঝায়। সত্ত্ব, রজ, ও তমঃ এই তিনটি গুণ। পরিদৃশ্যমান জগতের কি চেতন, কি অচেতন, সকল বস্তুরই মূলে যে প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে, সেই প্রকৃতি এই তিন গুণের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"সত্ত্বং রজ স্তম ইতি এবৈব প্রকৃতিঃ সদা।" সাংখ্য।

"সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন পদার্থই প্রকৃতি।" বস্তুতঃ সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে, ইহারা প্রকৃতির স্বরূপ।

"সত্ত্বাদীনাম্ তদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ।" ৬।৩৯ সাংখ্য।

"সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে, ইহারা প্রকৃতির স্বরূপ।" জগৎ ব্যক্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে একমাত্র এই তিনগুণই সাম্যাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। জগতের এই যে নানাত্ব, এই অনন্ত বৈচিত্র্য এই ত্রিগুণের বিভিন্ন মাত্রায় সংশ্লেষ ও বিশ্লেষের ফল মাত্র। এই যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বাতাস, আলো, অন্ধকার, পৃথিবী, মানুষ, কীট, পতঙ্গ, যাহা কিছু জগতে পরিদৃশ্যমান, সকলই এই ত্রিগুণের বিভিন্ন মাত্রায় পরিণামের ফল ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। হিন্দুশাস্ত্রের যাবতীয় তত্ত্ব মূলতঃ এই ত্রিগুণকে অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যাত ও প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। হিন্দুর সমাজবিজ্ঞান, জীবন-বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র,

ব্যবহারশাস্ত্র, হিন্দুর মুক্তি, পরকাল, আত্মার অমরত্ব, অধিকারিভেদ, সাধনার তারতম্য ইত্যাদি সকল তত্ত্বই এই ত্রিগুণকে মূল ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত।

"প্রকরোতি ইতি প্রকৃতি", যে উপাদানে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির অপর নাম অব্যক্ত। অব্যক্তের ব্যক্ত অবস্থার নাম সৃষ্টি।

"কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি প্রতিগুণাশ্রয় বিশেষাৎ।" ১৬ কারিকা।

"জগতের মূল কারণরূপা অব্যক্তা প্রকৃতি আছেন। তিনি ত্রিগুণাত্মিকা; গুণত্রয়ের পরিণাম স্বভাব এবং পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে থাকিয়া মিলিতভাবে কার্য্যকারিত্ব হেতু ভিন্ন ভিন্ন সম্মিলনে ভিন্ন ভিন্ন গুণের আধিক্যবশতঃ অনন্ত বিচিত্ররূপে জগৎ প্রকাশিত হয়। মেঘনিঃসৃত জল যেমন বিভিন্ন প্রকার আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গোদক, নারিকেলোদক ইত্যাদি বিভিন্নরূপে পরিণত হয়, গুণ সকলের বিচিত্র পরিণামও তদ্রূপ। গুণত্রয়ের কোন সম্মিলনে যে গুণটির আধিক্য থাকে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া অপর দুইটি অল্পমাত্রায় থাকিয়া তাহার গুণরূপে প্রকাশিত হয়। এইরূপ গুণত্রয়ের পরিণামভেদে তাহাদের বিমিশ্রণে জগৎ অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।"

যে অবস্থায় কোন একটি গুণ অপরকে অভিভূত করিয়া প্রবল হইয়া উঠিতে পারে না, তিনটি গুণই সমভাবে অবস্থান করে, কোনপ্রকার বিসদৃশ পরিণাম কাহারও হয় না, তাহাকে প্রকৃতি (জগৎ কারণ বা বীজাবস্থা) বলে।

("সত্ত্ব রজ তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" ১।৬১ সাংখ্য।)

ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বের বা প্রলয়কালীন অবস্থা। এই অবস্থায় গুণত্রয়ের কোন প্রকার বিসদৃশ পরিণাম হয় না বটে, কিন্তু তখনও ভিতরে ভিতরে সদৃশ পরিণাম হইতে থাকে। কারণ প্রকৃতি পরিণামিত না হইয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না ("না পরিণাম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে—গীতা") প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বা অঙ্গস্বরূপ যে রজঃ গুণ তাহার স্বভাবই প্রতিনিয়ত নিজেও পরিণামিত হওয়া ও অপর দুই গুণকে পরিণামিত করা ("উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ—কারিকা") আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বস্তুতঃ সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে, ইহারা প্রকৃতির স্বরূপ। ("সত্ত্বাদীনাম্ তদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ।" ৬—৩৯ সাংখ্য)। কাজেই গুণত্রয় সাম্যাবস্থাতেই থাকুক, আর বৈষম্যাবস্থাতেই থাকুক, রজোগুণ অপর দুই গুণের অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিত থাকায় পরিণাম কখনও বন্ধ থাকিতে পারে না। কিন্তু তখন সদৃশ পরিণাম হয় মাত্র, কেহই অপর কাহাকেও হীন করিয়া নিজে প্রবল হইতে পারে না। কাজেই কোন প্রকার বৈষম্যও তখন উপস্থিত হয় না, এবং জগৎও প্রকাশিত হইতে পারে না।

কিন্তু এ অবস্থায় গুণত্রয় বরাবর থাকিতে পারে না। পরস্পর বিরোধী শক্তিত্রয়ের চির-সংগ্রাম অনন্তকাল ধরিয়া হইতেছে। ইহার কখনও বিরাম নাই। সদৃশ-পরিণামকালে প্রকৃতির কোনও রূপ বিকার উপস্থিত হয় না বটে, তখন প্রকৃতি এক প্রকার নিদ্রাভিভূত বা

সমাধিস্থের ন্যায় অবস্থায় থাকে, কিন্তু তখনও ভিতরে ভিতরে এই সংগ্রাম চলিতে থাকে, এবং যখনই এই শক্তি-সংগ্রামে একটি অপর দুইটিকে কিঞ্চিৎ পরাভূত করিয়া প্রবল হইয়া উঠে, তখনই গুণত্রয়ের বৈষম্য উপস্থিত হয়, এবং প্রকৃতির মধ্যে নানা প্রকার আলোড়ন বিলোড়ন আরম্ভ হয়। এইরূপে যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া উঠে (প্রকৃতির প্রথম পরিণামে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়), তখন প্রকৃতি পুরুষ-সাহচর্য্যে জগৎকে অনন্ত বিচিত্ররূপে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন ("রাগ-বিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টি" ২।৯) বিজ্ঞানে ইহাকেই Law of attraction and Repulsion অথবা Action and Reaction বলে। এইরূপে সৃষ্টিক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রকৃতি জড়বস্তু। প্রাকৃতিক গুণসকলও জড়। অচেতন জড়ের দ্বারা কি প্রকারে এই অচিন্ত্য বিচিত্র জগৎ, যাহার সৃষ্টি-কৌশল দর্শনে অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের বিকাশ দেখিয়া বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়, তাহা সম্ভবপর হইতে পারে ? অধিকন্তু সৃষ্ট জগৎ, জড় ও চেতন, এই উভয়বিধরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই যে চৈতন্যের প্রকাশ, ইহাও কি প্রাকৃতিক গুণেরই বিকার মাত্র ? সাংখ্যমতে তাহা হইতে পারে না। কারণ জড়বস্তু সকল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, তাহাদের কাহারও মধ্যে যে চৈতন্যোৎপাদিকা শক্তি আছে, তাহা সিদ্ধ হয় না।

"নসাং সিদ্ধিকাং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টে ॥" ৩।২০।

জীবের চৈতন্য পঞ্চভূতের বিমিশ্রণে উপজাত নহে, কারণ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতিকালীন, পঞ্চভূতের কোনটিতে চৈতন্য গুণ দেখা যায় না।"

"মদশক্তিবচ্চেৎ, প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সাংহত্যেতদুদ্ভব ॥" ৩।২২

বিভিন্ন বস্তুর রাসায়নিক সংমিশ্রণে যেমন সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তদ্রূপও জড়বস্তুসকলের সংমিশ্রণে চৈতন্য উৎপাদিত হইতে পারে না। কারণ মদ্যোৎপাদক বস্তু-সকলের প্রত্যেকের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে মাদকশক্তি বর্ত্তমান দেখা যায়। বিমিশ্রণ কার্য্য দ্বারা তাহার বিশেষরূপে অভিব্যক্তি হয় মাত্র। কিন্তু জড় বস্তুর কোনটিতেই তাহা দেখা যায় না। অতএব জড় হইতে চৈতন্যোৎপাদিত হইতে পারে না। তাহা ছাড়া জড় বস্তুর প্রকাশত্ব নাই। অতএব তাহার প্রকাশক পুরুষ বা আত্মা অবশ্যই আছেন। ("জড় প্রকাশা যোগাৎ প্রকাশঃ।" ১।১৪৫।) এই সকল গেল অনুমানের কথা। ইহা ছাড়া সকল প্রমাণের যাহা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, সেই শ্রুতি প্রমাণ রহিয়াছে। শ্রুতি প্রমাণ কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। (শ্রুত্যাসিদ্ধ জনাপলাপ স্তৎ প্রত্যক্ষ বাধাৎ ।১।৪৭) স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মা আছে। দেখা গেল, অনুমানাদি অপর কোন প্রমাণ দ্বারাও আত্মার অস্তিত্ববিষয়ক প্রমাণ প্রাহ ত হয়ই না, অধিকন্তু সকল প্রমাণই ইহার অনুকূল। অতএব সার সিদ্ধান্ত এই,—

অস্ত্যাত্মা, নাস্তি সাধনাভাবাৎ ।৬।১

"প্রত্যক্ষ অনুমান বা আপ্ত কোন প্রমাণের দ্বারাই "আত্মা নাই" ইহা প্রতিপন্ন হয় না, বরং সকল প্রমাণই ইহার অনুকূল। অতএব আত্মা আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে"।

এই আত্মার সহিত প্রকৃতির নিত্য সান্নিধ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই আত্মার সান্নিধ্যবশতঃই প্রকৃতি অচেতন হইয়াও চেতনবৎ প্রতীয়মান হন (তৎসংযোগাদ্ চেতনং চেতনাবদিবলিঙ্গম্। ২০ কারিকা) যেমন অয়স্কান্তমণির সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হইয়া লৌহ অয়স্কান্তমণির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, এবং অপর লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে, তদ্রূপ পুরুষের সান্নিধ্যরূপ সংযোগ হেতু প্রকৃতি চেতনস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ করেন (তৎ সান্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।১।৯৬)

আত্মা নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন, নির্গুণ, কোন প্রকার গুণসঙ্গ আত্মাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। পুরুষের যে বন্ধ কল্পিত হয় তাহা প্রকৃতি তদাশ্রয়ে থাকা বশতঃই হইয়া থাকে, নতুবা হইত না।

"ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্ত তদ্যোগ স্তদ্যোগাদৃতে" ।১।১৯।

আত্মা নিত্য শুদ্ধ (অবিকারী), বুদ্ধ (চেতনস্বভাব), মুক্ত (গুণসঙ্গাতীত নির্গুণ) স্বভাব ; তাহার যে বন্ধ কল্পিত হয়, তাহা প্রকৃতি তদাশ্রয়ে থাকা বশতঃই হইয়া থাকে, নতুবা হইত না। প্রকৃতি নিত্য, তৎসহ সান্নিধ্য সম্বন্ধে অবস্থিত থাকায়, ঐ বন্ধ পুরুষের কল্পিত হয়। যেমন জবাকুসুমের ছায়া নির্ম্মল স্ফটিকে পতিত হইলে স্ফটিক স্বরূপতঃ স্বচ্ছ থাকিয়াও (আরক্তিম ছায়া তদাশ্রয়ে থাকাতে) রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ আত্মা নির্গুণ হইলেও প্রকৃতিরূপ ছায়া সংযোগ হেতু সগুণ বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। ছায়া স্ফটিকে থাকিয়াও স্ফটিককে যেমন স্বরূপতঃ কলুষিত করিতে পারে না, গুণাত্মিকা প্রকৃতিও আত্মাতে উক্ত প্রকার সান্নিধ্যসম্বন্ধে অবস্থিত থাকিয়া আত্মার স্বরূপতঃ নির্গুণত্বের বাধা জন্মাইতে পারে না। আত্মার নির্গুণত্ব প্রতিপাদনার্থে সাংখ্যে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থিত হইয়াছে।

"সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ" ।১৭।

"(১) জাগতিক সমস্ত বস্তুই অপর কাহারও ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তদ্দ্বারা এতৎ সমস্তের অতিরিক্ত ভোক্তা পুরুষ আছেন, ইহা সহজ অনুমানসিদ্ধ। (২) গুণসকল চৈতন্যধর্ম্মবিহীন, সুতরাং ভোগ করিতে অসমর্থ (কারণ সুখ স্বয়ং সুখের ভোগ-কর্ত্তা হইতে পারেন না)। অতএব যখন প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত গুণত্রয়ের নানাবিধ বিচিত্র সম্মিলন দৃষ্ট হয়, তখন গুণাত্মক ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল, গুণধর্ম্মাতীত, ভোগসামর্থ্য-বিশিষ্ট চৈতন্যময় পুরুষ আছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। (৩) গুণময় দেহে পুরুষের জীবিত কালে অধিষ্ঠান, মৃত্যুকালে প্রয়াণ দৃষ্ট হয়, সুতরাং দেহ হইতে পুরুষ অতিরিক্ত, ইহা স্বীকার্য্য। (৪) একদিকে বস্তু সমস্ত যেমন পরের প্রয়োজন সাধনের জন্য গঠিত হওয়া দৃষ্ট হয়, অপর দিকে তদ্রূপ পুরুষের জাগতিক বস্তুর ভোক্তৃভাব থাকা দৃষ্ট হয়। এই ভোক্তৃত্ব ভাব থাকা সত্ত্বেও পুরুষকে ভোগ্য বস্তু সকল হইতে পৃথক্ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। (৫) অবশেষে গুণসঙ্গবিবর্জ্জিত কৈবল্যের নিমিত্ত প্রবৃত্তির সাহায্যে ইহা

নিশ্চয়রূপে প্রতিপন্ন হয়, পুরুষ গুণাতীত। গুণাতীত না হইলে এইরূপ প্রবৃত্তি হইত না।"

অধিকন্তু স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন, "অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ"। আত্মা সর্ব্বপ্রকার গুণসঙ্গবিবর্জ্জিত, অতএব তিনি কোন ধর্ম্মযুক্ত নহেন (নির্গুণাত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মা ১ ১৪৬) অতএব সিদ্ধান্ত এই,—

তস্মাৎ তৎসংযোগাদ্ চেতনং চেতনবদিবলিঙ্গম্।
গুণকর্ত্তৃত্বেঽচেতনা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥২০॥

পুরুষ স্বভাবতঃ নির্গুণ ও অকর্ত্তা হওয়াতে, এবং প্রকৃতি স্বভাবতঃ জড়রূপা হওয়াতে, ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, পুরুষের সহিত সংযোগহেতু অচেতন মহদাদি বস্তু চেতনাবিশিষ্টের ন্যায় প্রকাশিত হয়, এবং পুরুষ নিঃসঙ্গ নির্ব্বিকার হইলেও গুণের কর্ত্তৃত্বে স্বয়ং কর্ত্তার ন্যায় প্রকাশিত হয়েন, এবং

পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগ গুৎ কৃতস্বর্গঃ। ২১।

যেমন অন্ধ দেখিতে পায় না ও পঙ্গু পথ চলিতে পারে না, কিন্তু পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথ প্রদর্শন করিলে তাহার প্রেরণায় অন্ধ পথ চলে, এবং উভয়ের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, অচেতন প্রকৃতি ও চেতন পুরুষও তদ্রূপ সংযুক্ত হইয়া সৃষ্টি-কার্য্য প্রবর্ত্তিত করে।

"প্রকৃতের্মহাং স্ততোঽহঙ্কার স্তস্মাদগণশ্চকেরশকঃ
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্য পঞ্চভূতানি।" ২২ কারিকা

"প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই ষোড়শ পদার্থ এবং এই ষোড়শ পদার্থের মধ্যে পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়।"

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ব। গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে প্রকৃতির সত্ত্বাংশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহারাই নাম মহত্তত্ব। ইহা জগতের সমষ্টি বুদ্ধি বা সমষ্টি জ্ঞান। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উচ্চতর দেবতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই এমন কি জড়বৎ পদার্থেও যে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি দেখা যায়, এই মহত্তত্বই তাহার কারণ, সমস্ত জ্ঞান বা বুদ্ধিই এই সমষ্টি বুদ্ধির অংশ মাত্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণের মতে ক্রমোন্নতির নিয়মে প্রকৃতির চরম পরিণামে বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি ও উন্নতি হয়। এ বিষয়ে হিন্দুমতের সহিত বিজ্ঞান-বাদীদিগের বিরোধ দৃষ্ট হয়। হিন্দুমতে যাহা ছিল না, তাহার সৃষ্টি হইতে পারে না (না বস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ ।১।৭৮), যাহা নাই তাহা হইতে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না, অথবা বিনা কারণেই কোন কার্য্যরই উৎপত্তি হয় না। শুধু তাহাই নহে; উপযুক্ত কারণ হইতেই উপযুক্ত কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব, যে কোন বস্তু হইতে যে কোন বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। যে বস্তুতে যেরূপ শক্তি আছে সে বস্তু তাহার অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন হেতু হইতেই উৎপন্ন হয় (শক্তস্য শক্য কারণাৎ ।১।১১৭) উপযুক্ত বস্তুমাত্রেই তৎকারণ রূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে দেখা যায় (কারণভাবাচ্চ ।১।১১৮।)। সুতরাং কারণ বস্তুতে শক্তিরূপে কার্য্যবস্তু বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ কার্য্যটি কারণেরই অভিব্যক্তি মাত্র।

আমরা জগতে যত প্রকার শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই, সেই সকল শক্তিরই চরম বিকাশ বুদ্ধিতত্ত্ব বা মননবৃত্তি। বুদ্ধি অপেক্ষা শক্তির উচ্চতর বিকাশ আর নাই। বুদ্ধি বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ অথবা প্রকৃতিতে গুণ-ক্ষোভজনিত সত্ত্বাংশের প্রাবল্যে যে প্রথম পরিণাম হয় তাহাই মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, এবং ইহার অতি সামান্য অংশ হইতেই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছে। সেই জন্য আমাদের ব্যষ্টি বুদ্ধি ও মন এই সমষ্টি বুদ্ধি মহত্তত্ত্বের অধীন। ইহাই সমস্ত জগৎ কার্য্যের আদি কারণ।

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ। ১।৭১। প্রকৃতির যাহা প্রথম কার্য্য (প্রথম পরিণাম) তাহাই মহত্তত্ত্ব, তাহা মননবৃত্তিক। ইহা হইতেই সমস্ত জগৎ ব্যাপার প্রবর্ত্তিত হয়। পুরুষ এই মহত্তত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতিতে অবস্থান করেন এবং প্রাকৃতিক গুণবিকার সকল উপভোগ করেন। এই বুদ্ধির সহিত পুরুষের একাত্মভাবই জগৎসৃষ্টির মূলকারণ। বুদ্ধি নানা বিকারে বিকারগ্রস্ত হন। রজঃ ও তমঃ গুণ প্রবল হইয়া উঠিলে বুদ্ধির এক প্রকার মোহাচ্ছন্ন আত্মস্বরূপ-বিচ্যুতি ভাব আসে, তাহারই নাম অবিদ্যা বা অজ্ঞান। এই অবিদ্যা বুদ্ধির স্বরূপস্থ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, বুদ্ধিস্থ পুরুষকে বাস্তিতে মোহাচ্ছন্ন করিয়া, বুদ্ধি ও পুরুষ যেন একই বস্তু এইরূপ প্রতীয়মান করায়, তাহা হইতেই অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। পুরুষের রাগ-বিরাগাত্মক আমিত্ব ভাব আসে। প্রকৃতিস্থ সত্ত্বাংশের প্রাবল্যে যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহারই নাম মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব যখন রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া অধোগামী হইতে আরম্ভ হয়, তখনই অধস্তম তত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় ও গুণ সকলের নানা পরিণামে জগৎ অনন্ত বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই যে বিচিত্ররূপে জগতের প্রকাশ অর্থাৎ যেই কারণ, বা যেই তত্ত্ব হইতে জগতের এই অনন্ত বৈচিত্র্য-সকল উদ্ভূত হইতেছে, তাহাই অহংতত্ত্ব। এই অহংতত্ত্ব এক প্রকার জ্ঞান। আমি, তুমি, এটা, সেটা এই যে বিশেষ বিশেষ পরিণমিত জ্ঞান, ইহারই নাম অহং তত্ত্ব। প্রকৃতিস্থ সত্ত্বাংশ (মহত্তত্ত্ব) রজো ও তমো গুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া যে দ্বিতীয় পরিণাম উপস্থিত হয়, তাহারই নাম অহংতত্ত্ব। বিচিত্ররূপে বিশেষ বিশেষ ভাবে জগৎ যে প্রকাশমান হইতেছে, অভিমানাত্মক অহংতত্ত্বই (অভিমানোঽহঙ্কারঃ ২।১৬ সাংখ্য।) তাহার কারণ। এই অহংতত্ত্ব হইতে প্রধানতঃ সত্ত্বাংশে মন নামক একাদশ তম ইন্দ্রিয় এবং তমসাংশে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত এবং পঞ্চ মহাভূতের প্রপঞ্চিকরণে অসংখ্যরূপে এই অনন্ত বিচিত্র জগতের উদ্ভব হয়।

ইহাই সাংখ্য-মত। জন্ম মৃত্যু কি তাহা বুঝিতে হইলে সকলের আগে বিশ্বের মূল তত্ত্ব বা রহস্যগুলি বুঝিয়া দেখা দরকার, তাহা না হইলে জন্ম, মৃত্যু ও পরকাল তত্ত্বের দুর্ভেদ্য রহস্য-জাল ভেদ করিবার উপায় নাই। তাই আমরা সকলের আগে সুসংক্ষিপ্তভাবে সাংখ্যোক্ত জগতত্ত্ব আলোচনা করিয়া লইলাম। বিশ্ব-রহস্য-বর্ণনায় সাংখ্যশাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান। হিন্দু-দর্শনের আদি দর্শন সাংখ্য। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস গ্রন্থে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়

লিখিয়াছেন, "বোধ হয় সাংখ্যদর্শনই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দর্শন।" হিন্দু শাস্ত্রে সাংখ্যপ্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল, আদি বিদ্বান্ বা মোক্ষ ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। মহাভারতে কথিত হইয়াছে—

"জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু রাজন
বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে
সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র॥"

"মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে বেদ সকলে, সাংখ্য ও যোগ-সম্প্রদায়ে এবং বিবিধ পুরাণে যে বিবিধ জ্ঞান দেখা যায়, তাহা সমস্তই সাংখ্য হইতে আসিয়াছে।" গীতায় ভগবান্ কপিলকে সিদ্ধ মহর্ষিদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতে কপিল অন্যতম অবতার বলিয়া কথিত। উপনিষদেও আছে, "ঋষিং কপিলকং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি" ইত্যাদি।

সাংখ্য আদি দর্শন হইলেও সাংখ্য-মত কিন্তু হিন্দু দর্শনের চরম মত নহে। হিন্দু-দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত বেদান্তে। সাংখ্যের পর পুরাণগুলিতে সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসকল বেদান্তের সহিত সমন্বিত হইয়া রূপক সহযোগে এক অভিনব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। পুরাণ লিখিতে হইলেই সকলের আগে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা প্রয়োজন। সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিতে হইলে সাংখ্যতত্ত্ব ছাড়া উপায় নাই। কাজেই পুরাণগুলিতে বেদান্তের সহিত সমন্বিত হইয়া সাংখ্যতত্ত্ব সকল আরও বহুলরূপে বিশদীকৃত হয়। সাংখ্যমতের চরম পরিণতি আমার মনে হয়, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়। গীতায় এই সকল তত্ত্ব, বেদান্তের ভক্তিবাদ ও অন্যান্য দর্শনগুলির সিদ্ধান্তের সহিত সমন্বিত হইয়া চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে।

আমরা দেখিলাম, মূল প্রকৃতির তিন গুণই বিকার প্রাপ্ত হয়। মহদাদি সপ্ত প্রকৃতি ঐ তিন গুণেরই বিকার। পুরুষ বা আত্মা এই ত্রিগুণের অতীত নিত্য পদার্থ, তাহার কোন বিকার নাই।

মূল প্রকৃতির বিকৃতি মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত
ষোড়শ কস্তু বিকার ন প্রকৃতি ন বিকৃতি পুরুষঃ॥ ৩ কারিকা।

"মূল প্রকৃতি অপর কাহারও বিকার নহে। মহদাদি সপ্তবিধ বিকার প্রকৃতির আছে (যাহা সৃষ্ট জগতের উপাদান; যথা মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র।)। ইহাদিগের বিকার ষোড়শবিধ;—যথা,—একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত। পুরুষ প্রকৃতিও নহে, প্রকৃতির বিকারও নহে, উভয় হইতে ভিন্ন।"

সাংখ্যের পুরুষ গীতার পরা প্রকৃতি, মহদাদি সপ্ত বিকার ও মূল প্রকৃতি, গীতায় অষ্ট অপরা প্রকৃতি

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৭।৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫

ভগবান্ বলিতেছেন,—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটি আমার বিভিন্ন অপরা প্রকৃতি, এতদ্ব্যতীত আমার আর একটি প্রকৃতি আছে,—তাহা জীবভূতা পরা প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতি জগৎ ধারণ করে।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই পদার্থই বিশ্বের চরম পদার্থ। ইহারা নিত্য দ্বৈত (ultimate duality) (প্রকৃতি পুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বম্ নিত্যম্। ৫। ৭২)। এই দুই পদার্থের পর বা ইহার অধিক আর কিছুই নাই। গীতা বা বেদান্তের মত কিন্তু তাহা নহে। গীতার মতে এই পুরুষ ও প্রকৃতির অতীত পুরুষোত্তম রহিয়াছেন। তিনিই একমাত্র পরম পদার্থ। পরা ও অপরা উভয় প্রকৃতিই তাঁহা হইতে জাত বা তাঁহারই অঙ্গস্বরূপ। তিনিই উভ-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬

ভূতসকল পরা ও অপরা এই দুই প্রকৃতি হইতে জাত। কিন্তু সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃত্তি।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥ ৭

আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সূত্রগ্রথিত মণিমালার ন্যায় সমস্ত বিশ্ব আমাতেই অবস্থান করিতেছে।

বেদান্তমতে শ্রুতি স্বয়ং জগৎ-কারণের ঈক্ষণ-শক্তি (জ্ঞানপূর্ব্বক দর্শনশক্তি) থাকা উল্লেখ করিয়াছেন (তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। ৬। ২ ছান্দোগ্য)। কিন্তু অচেতন প্রধানের সেই শক্তি থাকিতে পারে না,—সাংখ্যমতেই তাহা স্বীকৃত নহে। অতএব সাংখ্যোক্ত প্রধান জগৎ কারণ হইতে পারে না (ঈক্ষতের্নাশব্দম্। ১। ১। ৫ বেদান্ত)। জগৎ কারণ সেই পরম পদার্থ পরব্রহ্ম। তাঁহার দ্বারাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় প্রভৃতি যাবতীয় বিশ্ব-ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতেছে। (জন্মাদ্যস্য যতঃ। ১। ১। ২ বেদান্ত)। এই সিদ্ধান্তই শ্রুতি-প্রমাণ-সিদ্ধ। (যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি * * তদ্ব্রহ্মেতি। তৈত্তিরিয়।) গীতায় ভগবান এই সকল দ্বন্দ্বের সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পরা ও অপরা উভয় প্রকৃতি আমারই। অর্থাৎ এই দুই প্রকৃতি আমারই অঙ্গস্বরূপ (মে * * প্রকৃতিঃ। ৭। ৫)

অষ্ট অপরা প্রকৃতি সদা কর্ম্মনিরত এবং বৈষম্য ভাবাপন্ন। এই বৈষম্য, গুণের হ্রাস-বৃদ্ধি

ব্যতীত অপর কিছুই নহে। এই অষ্ট পদার্থের হ্রাস-বৃদ্ধিই জগৎ ও জীবের জনক, এবং সৃষ্টির বৈচিত্র্য সাধক।

এই অষ্ট প্রকৃতি যেমন বৈষম্যময়ী, পরা প্রকৃতি তদ্রূপ সাম্যময়ী। যেখানে সাম্যাবস্থা, সেখানে হ্রাস-বৃদ্ধি থাকিতে পারে না। যেখানে হ্রাস-বৃদ্ধির অভাব, সেখানে বিকার বা অবস্থান্তর বা কোনরূপ পরিবর্ত্তনও থাকিতে পারে না, কারণ পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর পদার্থের। পদার্থ গুণময়। আত্মা বা জীবাত্মা গুণের অতীত ;—তাই গীতায় বলা হইয়াছে ;—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২।২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২।২৪

আত্মাকে শস্ত্রে ছেদন, অগ্নিতে দাহন, জলে ক্লিন্ন ও বায়ুতে শোষণ করিতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগতঃ, স্থাণু, অচল ও সনাতন।

আত্মার স্তর অষ্ট প্রকৃতির উর্দ্ধে। আত্মা উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া অষ্টস্তরবিশিষ্ট জগদ্দেহকে ধারণ করে। ক্ষিত্যাদি পদার্থের অষ্টস্তর গুণময়, সমস্ত জীব ও জগৎ এই অষ্টস্তরের অন্তর্গত, সুতরাং সগুণ, সগুণ বলিয়া ক্রিয়াশীল, কিন্তু আত্মা উর্দ্ধ স্তরে অবস্থিতি করিয়া অষ্টস্তরবিশিষ্ট জগদ্দেহকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। সূত্রে যেমন মুক্তার মালা গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আত্মা হইতে জাত ত্রিগুণাত্মক একটি রজ্জুতে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডাবয়ব গ্রথিত। রজ্জুরূপী সেই গুণের হ্রাস-বৃদ্ধিতে ক্ষিত্যাদি অষ্ট পদার্থের এবং অষ্ট পদার্থজাত জীব ও উদ্ভিদ জগতেরই হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু উর্দ্ধ স্তরে অবস্থিত গুণাতীত পুরুষের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। কারণ তিনি বৈষম্যময়ী প্রকৃতির গুণের অন্তর্গত নহেন ও তজ্জন্য শস্ত্রের ছেদন গুণ, অগ্নির দহন গুণ, জলের ক্লেদন গুণ ও বায়ুর শোষণ গুণ তাঁহাকে ছিন্ন, দগ্ধ, ক্লিন্ন ও শুষ্ক করিতে পারে না। আর সেই জন্যই তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য ও অবিনাশী বা জরা-মরণাদি অবস্থান্তররহিত এবং একই অবস্থায় অবস্থিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী, স্থাণু বা স্থির, অচল ও সনাতন। যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি স্থাণু বা স্থির ভাবে একই স্থানে অবস্থিত, কারণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া যাহার স্থিতি, তাঁহার আর যাওয়ার স্থান কোথায় ? তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" ৫। ঈশ

"তিনি চল ও বটে, অচলও বটে ; তিনি অতি দূরে, অথচ অত্যন্ত নিকটে আছেন। তিনি এই সর্ব্বজগতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান আছেন।" প্রকৃতি অষ্টস্তর এবং তজ্জাত জীবজন্তু সসীম, তজ্জন্য জীবজন্তু এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করে, আর তাহাদের গমনাগমনের প্রয়োজনও আছে। ক্ষুত্তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তাহাদের আহারাদি আবশ্যক,

কিন্তু যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি আর যাইবেন কোথায়, যাইবার স্থানই বা কোথায়, এবং যাওয়ার প্রয়োজনই বা কি ?

ক্ষিতি, অপ্ দ্বারা আবৃত, অপ্ তেজ দ্বারা, তেজ বায়ু দ্বারা, বায়ু আকাশ দ্বারা, আকাশ মন দ্বারা, মন অহঙ্কার দ্বারা, অহঙ্কার বুদ্ধি দ্বারা ও বুদ্ধি সেই পরা প্রকৃতি বা আত্মা দ্বারা আবৃত; সুতরাং আত্মা সর্ব্বোপরি অবস্থিত এবং সেই গুণে বা রজ্জুতে জগদ্দেহ গ্রথিত। অতএব গুণের হ্রাস-বৃদ্ধিতে জগদ্দেহেরই হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, এবং তজ্জন্যই প্রতি মুহূর্ত্তে গুণ রূপান্তরিত হয়; কিন্তু যিনি গুণাতীত, তিনি হ্রাস-বৃদ্ধির অতীত; অতএব তাঁহার রূপান্তরের বা অবস্থান্তরের সম্ভাবনা কোথায় ? বস্তুতঃ গুণের বৈষম্যই হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ এবং সেই হ্রাস-বৃদ্ধি অপরা বা ভিন্না প্রকৃতির ক্রিয়া। উহারা বিভিন্ন প্রকৃতি বলিয়াই বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট, বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট বলিয়াই বিভিন্ন ক্রিয়াবিশিষ্ট এবং বিভিন্ন ক্রিয়াবিশিষ্ট বলিয়াই বিভিন্ন রূপের, বিভিন্ন গুণের ও বিভিন্ন রূপগুণবিশিষ্ট পদার্থের ও জীব-জন্তুর জনক, সেই জন্যই কোন পদার্থ বা জীবজন্তু একাকৃতি বা এক প্রকৃতির হয় না। ইহাই পরিণাম, রূপান্তর, গুণান্তর, দ্রব্যান্তর ও অবস্থান্তর এবং সেই অবস্থান্তরই জন্ম-মৃত্যু বা হ্রাস-বৃদ্ধি। কেবল জীবজন্তু বলিয়া নহে, অষ্ট প্রকৃতিবিশিষ্ট যে কোন পদার্থ এই জন্ম-মৃত্যু বা হ্রাস-বৃদ্ধির অধীন। জল অপেক্ষা অগ্নি প্রবল হইলে অগ্নি জলকে দাহন করে, বায়ু অপেক্ষা অগ্নি প্রবল হইলে অগ্নি বায়ুকে বিতাড়িত করে। বায়ু জল অপেক্ষা প্রবল হইলে জলকে শোষণ করে, অগ্নি অপেক্ষা প্রবল হইলে অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে, কিন্তু ইহা পদার্থের এককালে বিনাশ নহে, গুণের হ্রাস-বৃদ্ধি মাত্র। দেহে সর্ব্বদাই এই হ্রাস-বৃদ্ধি অনুভূত হয়। বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উদরাধ্মান উপস্থিত করিলে, স্ফীতি নিবারণার্থ অগ্নিগুণবিশিষ্ট পুল্‌টিস প্রয়োগে সেই ঘনীভূত বায়ু নিরতিশয় বিরলাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রোগীও তখন সুস্থতা লাভ করে, কিন্তু তজ্জন্য বায়ু এককালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। বায়ু বিনাশ প্রাপ্ত হইলে রোগীর প্রাণাত্যয় ঘটে, তখন আর দেহে প্রাণ থাকে না। এইরূপ জগৎ এবং জাগতিক সমস্ত পদার্থই গুণাবদ্ধ। এই যে দীপালোকটি রহিয়াছে, উহাও ত্রিগুণে আবদ্ধ এবং উহার প্রাণ বা জন্ম-মৃত্যু আছে। জীবের জন্ম দৃশ্যমান বা স্থূল সংহতাবস্থা, মৃত্যু অদৃশ্য বা সূক্ষ্মাবস্থা, জন্ম ঘনীভূতাবস্থা, মৃত্যু বিরলাবস্থা। প্রজ্জলিত দীপটি সহসা বাত্যাঘাতে নির্ব্বাপিত হইলে, তৎসঙ্গে আলোকিত গৃহ অন্ধকারাবৃত হয়, তখন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার কারণ অগ্নিগুণের বিরলাবস্থা, ইহাই দীপালোকের মৃত্যু। আবার দীপালোকের প্রয়োজন অনুভূত হইলে, একটি দিয়াসলাইর বাক্সের গাত্রে একটি কাঠি ঘর্ষণ কর, দেখিবে অগ্নি প্রজ্বলিত এবং গৃহ আলোকিত হইয়াছে; বাক্সের সহিত এই কাঠির ঘর্ষণ, ইহাই অগ্নিগুণের বৃদ্ধি এবং ইহাই অগ্নির জন্ম। ক্রিয়ার বিকাশ গুণের বৃদ্ধির অবস্থা, এই অবস্থাই পদার্থের ঘনীভূত, স্থূল ও দৃশ্যমানাবস্থা এবং এই অবস্থাই আলোকের জন্ম। গুণের বৃদ্ধিতে জন্ম এবং হ্রাসে মৃত্যু। গুণবৈষম্যে বা হ্রাস-বৃদ্ধিতে জীবের জন্ম বা মৃত্যু কথিত হইয়া থাকে।

কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, জীবের প্রকৃত জীবত্ব যাহা লইয়া, তাহা গুণাতীত পদার্থ। অতএব গুণের হ্রাস-বৃদ্ধিতে জীবের জন্ম বা মৃত্যু কি করিয়া হইতে পারে? বস্তুতঃ তাহা হইতে পারে না। যাহাকে আমরা জন্ম-মৃত্যু মনে করি, তাহা আমাদের ভুল জ্ঞান মাত্র। এই ভুল জ্ঞান ভ্রান্তি বা অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায়ই আমরা আমাদের অমৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। বস্তুতঃ জীবের জন্ম-মৃত্যু নাই। আমরা যাহাকে জন্ম-মৃত্যু বলি, তাহা আর কিছুই না,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২। ২২

মানুষ যেমন জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিয়া নব বাস গ্রহণ করে, সেইরূপ জীব জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করে। ইহাই জীবের জন্ম বা মৃত্যু।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

বৃন্দ ও মাধব।

আজকাল আমরা আয়ুর্ব্বেদের যতগুলি সংগ্রহগ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে 'রুগ্বিনিশ্চয়-সংগ্রহ' বা 'মাধব-নিদান' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আয়ুর্ব্বেদের বিভিন্ন মূল সংহিতাগ্রন্থ হইতে চিকিৎসাঙ্গের নিদানভাগ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। ইহার অধ্যায়-সন্নিবেশের ক্রমও নূতন প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় মাধব কর এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া আমাদের দেশে চিরপ্রসিদ্ধ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, কিন্তু গ্রন্থের কোন স্থলেই গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনকার মুদ্রিত নিদানের পরিশিষ্টাংশে ইন্দুকর বা ইন্দ্রকরাত্মজ শ্রীমাধব এই গ্রন্থের কর্ত্তা বলিয়া একটি শ্লোক দেখা যায়(১), কিন্তু তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই আমরা অনুমান করি। পরিশিষ্টাংশের টীকাকার শ্রীকণ্ঠ দত্তও এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই, এমন কি পাঠও ধরেন নাই। আদি হইতে অন্তক গ্রন্থকারের উক্তি ব্যাখ্যা না করিলেও পাঠ ধরা শ্রীকণ্ঠের টীকায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আরও, এই শ্রীকণ্ঠ দত্তই বৃন্দ প্রণীত সিদ্ধযোগ টীকায় গ্রন্থকৃৎ পরিচয় বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং নিদানের উক্ত পরিচায়ক শ্লোকটীও ব্যাখ্যা করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত। এইরূপ ব্যতিক্রম দেখিয়াই আমরা অনুমান করি যে, শ্রীকণ্ঠ যৎকালে টীকা প্রণয়ন করেন,

(১) যুক্তাবিত্তং যত্র যদস্তি কিঞ্চিত্তৎ সর্ব্বমেবৈকৃত মত্র যত্নাৎ।
* বিনিশ্চয়ে সর্ব্বরুজাং নরাণাং শ্রীমাধবেনেন্দু(র) করাত্মজেন। নিঃ পরি।

তৎকালে গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের অস্তিত্ব ছিল না, পরে কেহ জনশ্রুতি অনুসারে একটি অনুষ্টুভ্ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

এই গ্রন্থের রচনা পরিপাটী অনুসরণ করিয়া তাহারই ক্রমে 'সিদ্ধযোগ' নামক একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। (১) উক্ত সিদ্ধযোগের রচয়িতার নিবাস বা রচনার কাল পুস্তকে উল্লিখিত না থাকিলেও গ্রন্থের আদিতে ও অন্তে গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার 'বৃন্দ' নামে নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই উভয় গ্রন্থ একই প্রণালীতে লিখিত হওয়ায় ও নিদানে গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত না থাকায় অনেকে এই দুই গ্রন্থকে একই গ্রন্থকারের রচিত বলিয়া মনে করেন। পাশ্চাত্য প্রগাঢ় পণ্ডিত ডাক্তার হর্ণলে মহোদয় এই মতের প্রধান প্রবর্ত্তক। তিনি কতিপয় দুর্লভ প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিয়া অসাধারণ পরিশ্রমে গত ১৯০৬ খৃঃ অব্দ হইতে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে চরক-সুশ্রুতাদির বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ঐ পত্রিকায় "সুশ্রুতের টীকাকারগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, রুগ্বিনিশ্চয়াখ্য নিদান গ্রন্থের গ্রন্থকারের বাস্তব নাম মাধব কর নহে। সিদ্ধযোগ প্রণেতা বৃন্দই ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নিদান গ্রন্থ ঐ সিদ্ধযোগের প্রথম ভাগ মাত্র। (২)

এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত না হওয়ায় এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইতেছে। সিদ্ধযোগকে নিদানের পরিশিষ্টরূপে স্বীকার করিতে হইলে ঐ গ্রন্থ অমার্জনীয় পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। (৩) যদি নিদান ও সিদ্ধযোগ একই গ্রন্থকারের একই গ্রন্থবিশেষের খণ্ডদ্বয়রূপে পরিগণিত হইত, তবে একই বিষয় উভয়ত্র উল্লিখিত হওয়ায় গ্রন্থখানি শাব্দ ও আর্থ পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িত। একই বিষয়ে যেন একই শ্লোক উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। (৪) প্রাচ্য পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে পুনরুক্তি দোষ অমার্জনীয় বলিয়াছেন, এ অবস্থায় মহামতি বৃন্দ যে জ্ঞাতসারে গ্রন্থখানি এ প্রকার দুষ্ট করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং উভয় গ্রন্থ ভিন্ন গ্রন্থকারের স্বীকার করাই কর্ত্তব্য।

(১) নানামত প্রথিত দৃষ্টফল প্রয়োগৈঃ প্রস্তাববাক্য সহিতৈরিহ সিদ্ধযোগঃ।
বৃন্দেন মন্দমতিনাত্মহিতার্থিনায়ং সংলিখ্যতে গদবিনিশ্চয়জক্রমেণ। সিদ্ধযোগ, ২য় পৃষ্ঠা।

(২) It seems quite clear, therefore, that the Rugvinischaya was only the first part of larger work, the second part of which is Siddhayoga. J. R. A. S. 1906. p. p. 289.

(৩) যথা সকৃদুক্তার্থমপি বিরুক্তিঃ ক্রিয়তে, তৎপুনরুক্তমর্থাধিকম্। তচ্চ পুনরুক্তং দ্বিবিধং শব্দ পুনরুক্ত মর্থ পুনরুক্তঞ্চ চরক, বিমান, ৮ অং।

(৪) নিদান-গ্রন্থের জ্বরনিদানে "স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ" ইত্যাদি যে বচন দ্বারা জ্বরের লক্ষণ বলা হইয়াছে, ঐ শ্লোকটী সিদ্ধযোগের ৮ম পৃষ্ঠায় অবিকল উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাই শব্দ পুনরুক্তি। ইহা ব্যতীত বহু স্থলেই একই ব্যাধির ভিন্ন ভিন্ন শ্লোক দ্বারা উভয় গ্রন্থেই লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। নিদানে "দোষোঽল্পোঽহিতসম্ভূতো" ইত্যাদি বচন দ্বারা (৩১পৃঃ) যে বিষম জ্বরের লক্ষণ বলা হইয়াছে, সিদ্ধযোগে "কৃশানাং জ্বরমুক্তানাং" ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহারই লক্ষণ বলা হইয়াছে। এইরূপ তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরের লক্ষণ উভয় পুস্তকেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই অর্থ-পুনরুক্তি।

উভয় গ্রন্থের এক গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদনের জন্য ডাঃ হর্ণলে মহোদয় যে সমস্ত তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক।

১। তাঁহার প্রথম তর্ক :—বৃন্দ সিদ্ধযোগ নামক যে চিকিৎসা-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ রুগ্বিনিশ্চয় গ্রন্থের ক্রমে রচিত হইল। এস্থলে রুগ্বিনিশ্চয়ের গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ না করাতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, বৃন্দ প্রথমে নিজে রুগ্বিনিশ্চয় লিখিয়া পরে তদনুক্রমে সিদ্ধযোগ লিখিতেছেন। এইজন্যই তাঁহার কল্পিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড নিদানের শেষে আত্মপরিচয় প্রদান না করিয়া একেবারে গ্রন্থান্তে সিদ্ধযোগের শেষে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (১)

সিদ্ধযোগে রুগ্বিনিশ্চয়ের গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ না করাতেই উভয় গ্রন্থ একজনের অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যৎকালে সিদ্ধযোগ বিরচিত হইয়াছিল, তৎকালে নিদান গ্রন্থের গ্রন্থকার সর্ব্বত্র প্রথিতই ছিলেন, এইজন্যই বৃন্দ গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া থাকিতে পারেন। চক্রপাণি দত্ত স্বীয় চিকিৎসা গ্রন্থের শেষে বলিয়াছেন যে :—"এই গ্রন্থে "সিদ্ধযোগের" অতিরিক্ত সিদ্ধযোগ লিখিত হইল," কিন্তু সিদ্ধযোগের গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করেন নাই। (২) উক্ত যুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে চক্রদত্তকেও সিদ্ধযোগের দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যাইতে পারে। আজকাল অনেক গ্রন্থকারই পরবর্ত্তী সংস্করণে অধিক বিষয় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন।

২। গ্রন্থকারের একত্বে দ্বিতীয় যুক্তি :—'রুগ্বিনিশ্চয়' গ্রন্থ যেমন 'মাধব-নিদান' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত, এই সিদ্ধযোগও সেইরূপ 'বৃন্দ-মাধব' নামে প্রসিদ্ধ। (৩) সুতরাং উভয় গ্রন্থই একই গ্রন্থকারের রচিত। (৪)

সিদ্ধযোগকে 'বৃন্দমাধব' নামে প্রথিত হইতে দেখিয়াই বৃন্দ ও মাধবকে এক ব্যক্তি কল্পনা করা অপেক্ষা বিভিন্ন ব্যক্তি অনুমান করাই আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি। এই সংগ্রহ রচনা-প্রণালী মাধবই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বৃন্দ তাঁহারই ক্রম অনুসারে তাঁহারই ক্ষুণ্ণ সরণি অনুসরণ করিয়া সিদ্ধযোগ রচনা করিয়াছেন। এইজন্য প্রণালীর উদ্ভাবন-কর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ গ্রন্থের নামে নিজের নামের সহ মাধবের নামও যোগ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক ; নতুবা 'মাধব নিদানের' ন্যায় এই গ্রন্থ "মাধব সিদ্ধযোগ" নামে প্রথিত হওয়া উচিত ছিল। আরও এই বৃন্দ কেবল মাধবের ক্রমই গ্রহণ করেন নাই, সম্ভবতঃ মাধবের যে চিকিৎসা গ্রন্থ ছিল, তাহাও চক্রপাণির ন্যায় স্বীয় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া

---

(১) Vide J. R. A. S. 1906. P. P. 288. L 24.

(২) যঃ সিদ্ধযোগ লিখিতাধিক সিদ্ধযোগান্ অত্রৈব নিক্ষিপতি কেবল মুদ্ধবে। চক্র, শেষ পৃষ্ঠা।

(৩) বৃন্দমাধবাপর নামক সিদ্ধযোগ ব্যাখ্যায়াম্। সিদ্ধযোগ ৬৪ পৃষ্ঠা।

(৪) Vide J, R. A. S. 1906, P. P, 288. L 34.

লইয়াছেন। মাধবের যে চিকিৎসা গ্রন্থ ছিল, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে প্রতিপাদন করিয়াছি। (১) তাহা আজকাল না পাওয়া গেলেও তাহার দু'চারিটি বচন আজও দেখা যাইতেছে। সিদ্ধযোগের টীকায়ই নিম্নলিখিত কয়েকটী বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

সিদ্ধযোগ—৯ম পৃষ্ঠায় লঙ্ঘন শব্দের ব্যাখ্যায় :—

শ্রীমাধবোঽপ্যাহ—লঙ্ঘনং তদ্বিধাজ্ঞেয়ং শমনং শোধনঙ্কৃতং।

*   *   *   *

বমনং লঙ্ঘনং কুর্য্যাৎ কন্তেরক্তেৎ বলাদিকম্॥

৪৫১ পৃষ্ঠায়—

শ্রীমাধবোঽপ্যাহ—আদিত্যেঽহন্যদিতে নৃণামঞ্জনং ন হিতং মতম্। ইত্যাদি

৬১৫ পৃষ্ঠায়—

শ্রীমন্মাধব প্রাহ—লব্ধাশেচ(?) সমদোষত্বে সমাগ্নিস্নাময়স্তদা। ইত্যাদি

উক্ত চিকিৎসার বিধানসূচক বচনগুলি কোন চিকিৎসা গ্রন্থ ব্যতীত থাকিতে পারে না, সিদ্ধযোগের মূলেও নাই। এতাবং স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, সিদ্ধযোগ ব্যতীত মাধব করেরও একখানা চিকিৎসা গ্রন্থ ছিল। কালের কুটিল আবর্ত্তে মাধবের অন্যান্য গ্রন্থের সহ এখানিও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই অথবা চক্রপাণির ন্যায় মাধবের সমগ্র চিকিৎসা গ্রন্থই বৃন্দ সিদ্ধযোগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং পরম্পরাসম্বন্ধে সিদ্ধযোগে মাধবের মূল কর্ত্তৃত্ব থাকায় বৃন্দ ও মাধব উভয় গ্রন্থকারের নাম যোগ করিয়া গ্রন্থের অপর নাম নির্ব্বাচিত হইয়া থাকিবে।

৩। ডাঃ হর্ণলে মহোদয়ের তৃতীয় যুক্তি এই যে :—নিদান গ্রন্থের কোনও অংশেই গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হয় নাই। এই মাধব কর নামটি বিজয় রক্ষিত তাঁহার টীকার অনুক্রমণিকায় পঞ্চম শ্লোকে ধরিয়াছেন; ঐ টীকার নামব্যাখ্যা মধুকোষ (Store of honey); সুতরাং এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, কবিত্বের রীতি অনুসারে (Poetically) মূল গ্রন্থকারকে মাধবকর বা মধুকর (Maker of honey) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে ধৃতমাধব শব্দ মাধবকর দ্যোতক, যেমন চক্রপাণি দত্ত স্থলে চক্রপাণি ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত স্থলে শ্রীকণ্ঠ মাত্র অনেক স্থলেই বলা হইয়া থাকে। (২)

এই মাধবকর নামটী বিজয় রক্ষিত কর্ত্তৃকই প্রথম আবিষ্কৃত বা কবিত্বের হিসাবে (Poetically) কল্পিত হয় নাই। ভবন বিজয় রক্ষিতের পূর্ব্ববর্ত্তী। শ্রীকণ্ঠ দত্ত বিজয় রক্ষিতের শিষ্য, (৩) সুতরাং প্রায় সমসাময়িক। তিনি সিদ্ধযোগ টীকায় বহুস্থলে ভবনের উল্লেখ করিয়া

(১) পর্য্যায় রত্নমালা—উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের।

(২) Vide J. R, A. S. 1906 P. P. 289. L 4.

(৩) যেন ব্যাখ্যি ভগণা বিজয়েন শিষ্য শ্রেয়াশ্রীকণ্ঠবর্ত্তিমুখে। বঙ্গঃ। নিদান ১৬২ পৃষ্ঠা

গিয়াছেন। ভবনের গ্রন্থেও শ্রীমাধবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, (১) এমত অবস্থায় বিজয় রক্ষিতই প্রথম মাধবকর এই নামটী কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। আরও কবিত্বের হিসাবে নিদানের কর্ত্তাকেই মাধবকর বলা যাইতে পারে। কিন্তু অন্য গ্রন্থের কর্ত্তা-রূপে তাঁহার বাস্তবিক নাম বৃন্দ হইলে তাহাই বলা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু রক্ষিত

> ভট্টার জেজ্জর গদাধর বাপ্যচন্দ্র শ্রীচক্রপাণি বকুলেশ্বরসেন তোটৈঃ
> ঈশান কার্ত্তিক সুধীর সুকীর বৈদ্যৈ র্মৈত্রেয় মাধবমুখৈ র্লিখিতং বিচিন্ত্য।

নিদানের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইস্থলে মাধব নিদানের কর্ত্তারূপে উল্লিখিত হন নাই। নিদানের টীকা প্রস্তুত করিতে মাধবের অন্যান্য সংগ্রহ গ্রন্থ ও টীকা-টিপ্পনীই সহায়ক হইতে পারে। সেই সব গ্রন্থের কর্ত্তাকে এক গ্রন্থকার হইলে 'বৃন্দ' না বলিয়া 'মাধবকর' বলা কবিজনসুলভ নহে।

৪। সিদ্ধযোগের টীকাকার শ্রীকণ্ঠদত্তও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, এইরূপ ডাঃ হর্ণলে মহোদয়ের চতুর্থ তর্ক। তিনি বলেন সিদ্ধযোগের বৃদ্ধি-চিকিৎসাধিকারে বৃদ্ধি নিদান (Diagonistic statement of Hydrocele) উক্ত হইয়াছে। তাহার টীকায় শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন যে :—বৃদ্ধিনিদান রুগ্বিনিশ্চয়ে বলা হয় নাই, সিদ্ধযোগে বলা হইল। এই বাক্য গ্রন্থকারের একত্বই সূচনা করিতেছে, যেহেতু এক গ্রন্থকার হইলে তাঁহার পূর্ব্বগ্রন্থের ন্যূনতা পূরণ দ্বিতীয় খণ্ডস্বরূপ অন্য গ্রন্থে আবশ্যক হয়। (২)

সিদ্ধযোগে বৃদ্ধি (Hydrocele) নিদান লিখিত হয় নাই। তবে ব্রধ্ন বা ব্রধ্নরোগের নিদান উক্ত হইয়াছে বটে। তাহার অনুবাদ Hydrocele ঠিক নহে। যাহা হউক উক্ত ব্রধ্ন-লক্ষণ সিদ্ধযোগে উক্ত হওয়ায় উভয় গ্রন্থের পৃথক্ কর্ত্তৃত্বই প্রমাণিত হইতেছে। আজ-কাল গ্রন্থের কিয়দংশ প্রণীত হইলেই তাহা খণ্ডাকারে মুদ্রিত হইয়া জনসাধারণে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় যদি কোন কারণে কোন বিষয় প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত না হয়, তবে দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়া ন্যূনতা-পূরণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন কালে এরূপভাবে পুস্তক প্রকাশিত হইত না। গ্রন্থকার জীবিতাবস্থায় তৎপ্রণীত গ্রন্থে কোন বিষয় ন্যূন বা অধিক হইয়াছে বোধ করিলে যথাস্থানেই লিখিত পত্রের উপরে পাঠ তুলিয়া ন্যূনতা-পূরণ করিতেন, এবং অধিক অংশ হরিতাল দিয়া মুছিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। যদি এইরূপ, রুগ্বিনিশ্চয় সংগ্রহে ব্রধ্ননিদান লিখিতে ভুল হওয়ায় সিদ্ধযোগ রচনা কালে ঐ বিষয় গ্রন্থকারের স্মৃতিপথে উদিত হইত, তবে এক গ্রন্থকার হইলে অনায়াসে রুগ্বিনিশ্চয় গ্রন্থের বৃদ্ধি নিদানের পৃষ্ঠায় দুই পঙ্‌ক্তি পাঠ উপরে তুলিয়া লিখিলেই পারিতেন। এরূপ

---

(১) ভবন টীকা (জীবানন্দ) ১ পৃষ্ঠা

(২) Vide J. R. A. S. 1906. P. P. 289. L. 27.

সুগম উপায় থাকিতে একই গ্রন্থকার হইলে চিকিৎসা-গ্রন্থে নিদান লিখিয়া অমার্জ্জনীয় অধিক দোষ (১) স্বীকার করা হইল কেন?

টীকাকার শ্রীকণ্ঠদত্ত গ্রন্থকারের একত্বের সমর্থন করিয়াছেন (২) এ কথা বলা যাইতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন—"রুগ্বিনিশ্চয়ে অনুক্তত্বাল্লক্ষণং লিখিতবান্ বৃন্দঃ" (সিঃ যোঃ ৩২৫ পৃঃ)। এই স্থলে বৃন্দের নাম গ্রহণ করায় স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, অন্যে যাহা করে নাই, বৃন্দ তাহা প্রথম করিলেন। এক গ্রন্থকার টীকাকারের অভিপ্রেত হইলে, এস্থলে 'বৃন্দ' এই নামের উল্লেখ করিতেন না। এখানে টীকাকারের অভিপ্রায় একটু অপ্রকাশিত আছে, কিন্তু পরিণাম-শূল-চিকিৎসায় শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন,—"এতচ্চ মাধবকরেণ রুগ্বিনিশ্চয়ে শূলাধিকার এব দর্শিতং, বৃন্দেন তু চিকিৎসিত বিধিযোগাৎ পৃথগধিকারেণ লিখিতম্। (সিঃ যোঃ ২৪৯ পৃঃ) এইরূপ জ্বরাতিসার চিকিৎসায় (৬৪ পৃঃ) মাধবকর ও বৃন্দ দুই নামই বলা হইয়াছে। সুতরাং টীকাকার মাধব ও বৃন্দকে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়াই জানিতেন। এইরূপ স্নায়ুক রোগনিদান সিদ্ধযোগে লিখিত হওয়ায় তাহার ব্যাখ্যায় শ্রীকণ্ঠ আরও স্পষ্ট বলিয়াছেন, —"প্রায়ঃ পাশ্চাত্য পুরুষ বিষয়স্তু তন্তুনামা খ্যাতস্ত" ইত্যাদি। এইটুকু টীকা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীকণ্ঠদত্ত বৃন্দকে মাধবকর অপেক্ষা পরবর্ত্তী কালের লোক বলিতেছেন। এবং মাধবকরের সময়ে বগ্ন বা স্নায়ুক ব্যাধি ছিল না বলিয়া তাহার লক্ষণ নিদানে লিখিত হয় নাই, এইরূপ কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে।

৫। বৃন্দ ও মাধবের একত্বে ডাক্তার হর্ণলে মহোদয় এইরূপ শেষ যুক্তি দেখাইয়াছেন। ডল্লন শ্রীমাধবকে সুশ্রুতের টিপ্পণকার বলিয়াছেন। সিদ্ধযোগে অনেক স্থলে যে সমস্ত সুশ্রুতোক্ত যোগ আছে, তাহার উপর বৃন্দ স্বীয় অভিমত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠ ঐ অভিমতটী টিপ্পণ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ টীপ্পনী করার অভ্যাস বৃন্দেরই দেখা যাইতেছে। সুতরাং ডল্লন যে 'টিপ্পনকার শ্রীমাধব' বলিয়াছেন, তাহা বৃন্দ ও মাধব অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই সিদ্ধযোগকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। (৩)

চিকিৎসা-সংগ্রহ গ্রন্থে মূল সংহিতোক্ত যে সমস্ত যোগ উল্লিখিত হয়, তাহার প্রস্তুতের প্রণালী ও দ্রব্যের পরিমাণ সূচক পরিভাষা না থাকিলে ব্যাখ্যাকারগণ নানাপ্রকার গণ্ডগোল করিতে পারেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া সংগ্রহকর্ত্তা অনেক যোগের প্রণালী সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত যোগের শেষে নিবদ্ধ করিয়া থাকেন। এই অভিমতকে আজ-কাল পরিভাষা বলা হইয়া থাকে। ঐ অভিমত প্রায়ই যোগের সহই শ্লোকে লিখিত হয়। টীকা বা টীপ্পনী এ রীতিতে লিখিত হয় না। এইরূপ নিজ অভিমত সহকারে নানা তন্ত্র হইতে সংগৃহীত যোগ এই গ্রন্থে

(১) অধিকং নাম ন্যূন বিপরীতং যথাসূর্দ্ধ্বো ভাষ্যমাণে বার্হস্পত্যমৌশনসমন্যথা বর্ধকিঞ্চিৎপ্রতি সূত্রার্থ মুচ্যতে। চরক বিমান স্থান ৮ অধ্যায়।

(২) In the same direction pointa a remark of Sreakantha Dutt. J. R. A. S. P. P. 289. 1906.

(৩) Vide J. R. A. S. 1906. P. P. 289-290.

উল্লিখিত হইবে, এইরূপই বৃন্দ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। (১) শ্রীকণ্ঠ এইরূপ পরিভাষাকে টীপ্পনী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা বিবৃতি মাত্র বোধক। শ্রীকণ্ঠ এই অর্থেই ১৩৪ পৃষ্ঠায় ও ২১৮ পৃষ্ঠায় সিদ্ধযোগের অন্ত ব্যাখ্যাকে টীপ্পনী শব্দে বুঝাইয়াছেন। আরও ডল্লনোক্ত শ্রীমাধবের টীপ্পনী কেবল সুশ্রুত গ্রন্থেরই বিবৃতি হইতে পারে। শ্রীকণ্ঠ যতগুলি বৃন্দের টিপ্পনী ধরিয়াছেন, তাহাতে চরক ও বাগ্‌ভট গ্রন্থের বিবৃতিও আছে। ৩১৬ পৃষ্ঠায় অজাজ্যাদিচূর্ণ বাগ্‌ভট হইতে ১৫৫ পৃষ্ঠায় তালিশত্ত্বমোদক চরক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ডল্লন যে শ্রীমাধবের টীপ্পনীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উদাহরণও আমরা পাইয়াছি। সেস্থলে মাধবকেই ব্যাখ্যাকর্ত্তা বলা হইয়াছে। সিদ্ধযোগ টীকায় (১৪৮ পৃঃ) অগস্ত্যহরিতকী ব্যাখ্যায় শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন "তেনেহ দ্বিহরিতকী ভক্ষণাৎ সিদ্ধং তাবৎ গুড়াং পলং ভক্ষ্যমিতি যোগব্যাখ্যায়ং মাধবকরাচার্য্যঃ।" এই যোগ সুশ্রুত উত্তরতন্ত্রে ৫১ অধ্যায়ে ৪৬।৪৮ শ্লোকে (৭৭৬ পৃঃ) কথিত হইয়াছে। তাহার উপর শ্রীমাধবের যে টিপ্পনী ছিল, তাহাই শ্রীকণ্ঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিদানের টীকাকার বিজয় রক্ষিতও মাধবের টিপ্পনী দেখিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বরূপের লক্ষণ ব্যাখ্যায়—শ্রমোরতি-বিবর্ণত্বং ইত্যাদি জ্বর পূর্ব্বরূপের (সুশ্রুত ৬৭৯ পৃঃ) মাধবের ব্যাখ্যা দেখিয়া লিখিয়াছেন, 'ইতি জেজ্জট বাপ্যচন্দ্রমাধব কার্ত্তিক কুণ্ডাদয়ো ব্যাচক্ষতে" (নিদান ৮ পৃঃ)। এই মাধবের ব্যাখ্যাই তাহার সুশ্রুত টিপ্পনী গ্রন্থ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আজ-কাল যতগুলি চিকিৎসা-সংগ্রহ গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে সিদ্ধযোগই প্রথম সংগৃহীত। সুতরাং তাহার গ্রন্থকার একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন ও বহু চিকিৎসা করিতেন, এইরূপ অনুমান করিতে হয়। নতুবা সংহিতার যোগসমুদ্র হইতে দৃষ্ট ফলপ্রয়োগ সিদ্ধযোগ বাছিয়া বাহির করা অসম্ভব। কিন্তু এই গ্রন্থকার চিকিৎসক ছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি আত্মহিতার্থী হইয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। (২) প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ পরোপকারার্থ, ক্ষত্রিয়গণ আত্মহিতার্থ ও বৈশ্যগণ বৃত্ত্যর্থ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেন। (৩) এই পুস্তকে 'আত্মহিতার্থিনা' এই বিশেষণ দেখিয়া মনে হয় গ্রন্থকার ক্ষত্রিয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহার ব্যবসায় বিশেষভাবে চিকিৎসা ছিল না, এবং তাঁহার দ্বারা অপরীক্ষিত সহস্র সহস্র যোগের মধ্য হইতে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধযোগ আহরণ করা সুগম ছিল না, এই অনুমান সঙ্গত। এ অবস্থায় পূর্ব্ববর্ত্তী মাধবকরের ক্রমের সহিত তাহার চিকিৎসা গ্রন্থের

---

(১) নানামত গ্রথিত দৃষ্টফল প্রয়োগৈঃ প্রস্তাববাক্য সহিতৈরিহ সিদ্ধযোগঃ। ১ পৃষ্ঠা।

(২) বৃন্দেন মন্দমতিনাত্মহিতার্থিনায়ঃ।
সংলিখ্যতে গদবিনিশ্চয়জ ক্রমেণ। ২য় পৃষ্ঠা।

(৩) স চাধ্যেতব্যো ব্রাহ্মণ রাজন্য বৈশ্যৈঃ তত্রানুগ্রহার্থং [illegible]নাং
ব্রাহ্মণৈঃ, আত্মরক্ষার্থং রাজন্যৈঃ বৃত্ত্যর্থং বৈশ্যৈঃ। চরক সূত্রস্থান ৩০ অধ্যায়।

নকল করা অসম্ভব নহে। বরং এই গ্রন্থের 'বৃন্দ মাধব' এই অপর নাম দেখিয়া বৃন্দ ও মাধব উভয়েরই এই গ্রন্থে কর্তৃত্ব ছিল, এরূপ অনুমান কতকটা বিচারসহ বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইতি—

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী।

কাষ্ঠাদি জ্বলে কেন ?

পুরাকালে পদার্থের দহন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জন-সাধারণের কিরূপ ধারণা ছিল, অগে তাহা জানা আবশ্যক। পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদেশে ষ্টাল (Stapl) প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলিতেন যে, কাষ্ঠাদিতে এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ অলক্ষিত ভাবে আছে, তজ্জন্যই কাষ্ঠাদি দহনশীল। অঙ্গার, গন্ধক, তৈলাদি দাহ্য বস্তুমাত্রেই এই সূক্ষ্ম পদার্থ বর্ত্তমান আছে, এবং তাহারা ইহার ভৌতিক (material) অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। এই সূক্ষ্ম পদার্থকেই তাঁহারা "অনুদ্ভূত তেজঃ" (Phlogiston) নামে অভিহিত করিয়াছেলেন। ষ্টালই এই অনুদ্ভূত তেজোবাদ বা ফ্লজিষ্টনবাদের আবিষ্কর্তা। তাঁহাদের মতে দাহ্য বস্তুমাত্রই যৌগিক পদার্থ এবং ফ্লজিষ্টন প্রত্যেকরই অন্যতর উপাদান। দাহ্য বস্তুসমূহে পরস্পর যে পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল ফ্লজিষ্টনের পরিমাণের তারতম্যবশতঃ এবং অন্যতর উপাদানের ধর্ম্মভেদে ঘটিয়া থাকে। দহনকালে যে বস্তু দগ্ধ হইতেছে, তাহার ফ্লজিষ্টন বহির্গত হইয়া যায় এবং তন্নিমিত্তই উত্তাপ, আলোক ও অগ্নিশিখা পরিলক্ষিত হয়। এই ফ্লজিষ্টনই সর্ব্বপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের মূলে বর্ত্তমান। উত্তাপ প্রয়োগে এই ফ্লজিষ্টন দূরীভূত হইলে কেবল ভস্ম পড়িয়া থাকে।

হিন্দু দার্শনিকদের মতে কাষ্ঠাদি পদার্থসমূহ পঞ্চভূতাত্মক। দহনকালে ইহাদিগের বায়বীয় উপাদানগুলি অগ্নি-সংযোগে চলিয়া যায়, কেবল ক্ষিতির অংশটুকু অবশিষ্ট থাকে। তাহাই ভস্ম। সুতরাং যে পরিমাণ কাষ্ঠাদি ভস্মীভূত হয়, ভস্মবিশিষ্ট পদার্থ তদপেক্ষা অনেক লঘু হইয়া থাকে।

বৈশেষিক দর্শন মতে তৈলাদি দাহ্য পদার্থে "স্নেহ" বর্ত্তমান আছে, ইহাই অগ্নি প্রজ্বলনের কারণ।

আরবদেশীয় রাসায়নিক পণ্ডিতগণের মতে পদার্থমাত্রই লবণ, গন্ধক এবং পারদ সংযোগে উৎপন্ন। এই শব্দত্রয় দ্রব্যের গুণজ্ঞাপক বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ লবণ অদাহ্য ভাগ (ভস্ম), গন্ধক দাহ্য ভাগ, পারদ তেজঃ বা জ্যোতিঃভাগ। কাষ্ঠ যেমন দগ্ধ হইয়া গেলে দগ্ধাবশেষ থাকে, সেইরূপ ধাতুও অগ্নি দগ্ধ হইলে "ধাতুভস্ম" অবশিষ্ট থাকে। এই ধাতুভস্ম অত্যন্ত লঘু। ধাতুমাত্রেই পারদের অংশ আছে বলিয়া এই ভস্ম ধাতুর গুণবিশিষ্ট। গন্ধক থাকে বলিয়াই

পদার্থসমূহ অগ্নিতাপে দগ্ধ হয়, এবং পারদের জন্যই পদার্থবিশেষে ধাতুর গুণ বর্ত্তমান আছে। আবার লবণ বর্ত্তমান থাকার জন্যই ধাতুনিচয় দ্রবীভূত হইতে পারে।

এই আরবীয় সিদ্ধান্তের সহিত হিন্দুদিগের পঞ্চভূত-বাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। ষ্টাল ও বেকারের ফ্লজিষ্টনবাদ আবার পঞ্চভূতবাদের ও আরবীয় "লবণ-গন্ধক-পারদ" বাদের রূপান্তর বিশেষ।

যাহা হউক, ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ লাবোয়াশিয়ের সময় পর্য্যন্ত একরূপ এই ফ্লজিষ্টনবাদ আদৃত বা প্রচলিত ছিল। বংশ-পরম্পরাগত সংস্কার মানব-হৃদয়ে এরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল থাকে যে, নূতন আলোক পাইলেও তাহার সাহায্যে সহসা পথ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরে আবার ক্যাবেণ্ডিস, প্রীষ্টলি, লাবোয়াশিয়ে প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পরীক্ষা দ্বারাই অচিরে উহা ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

রাসায়নিক সংযোগে যে উত্তাপ জন্মে, তাহা সকলেই দেখিতে পান ; কাষ্ঠাদি জ্বালাইয়া উত্তাপ জন্মান আর কিছুই নহে, কাষ্ঠের অঙ্গার উদ্‌জানের সহিত বায়ুস্থিত অম্লজানের সংযোগ-সাধন মাত্র ; যত অঙ্গার ও উদ্‌জান জ্বলিতে থাকে, অর্থাৎ অম্লজানের সহিত যুক্ত হইয়া যথাক্রমে অঙ্গারাম্ল বায়ু ও জল উৎপাদন করিতে থাকে, তত অধিক উত্তাপ বাহির হইয়া থাকে। এই অম্লজানই সাধারণ বাতাস ও জলের উপাদান বিশেষ এবং প্রাণিগণের জীবনধারণ ও দহন-ক্রিয়ার মূল। রাসায়নিক পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, প্রত্যেক এক সের অঙ্গার যখন অঙ্গারাম্ল বায়ুতে (কার্ব্বণিক এসিডে) পরিবর্ত্তিত হয়, তখন তাহা হইতে ৮০৮০ ভাগ উত্তাপ জন্মে, অর্থাৎ এত উত্তাপ যে, তদ্দ্বারা ৮০৮০ সের জল ১ ডিগ্রি—শতাংশিক উত্তপ্ত হইতে পারে। আবার এক সের উদ্‌জান যখন অম্লজানের সহিত যুক্ত হইয়া জল উৎপাদন করে, তখন ৩৪৪৬২ ভাগ উত্তাপ জন্মে। এইরূপ প্রতি এক ভাগ উত্তাপ দ্বারা ১৩৯০ ফুট পাউণ্ড কার্য্য করা যায়। এক পাউণ্ড এক ফুট উচ্চে উঠাইতে যে কার্য্য করিতে হয়, তাহাকে এক ফুট পাউণ্ড কহে। উত্তাপ হইতে কার্য্য, আর কার্য্য হইতে উত্তাপ হয়, ইহাও সকলে দেখিতে পান। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া উত্তাপ জন্মান, কার্য্য হইতে উত্তাপের উৎপাদন মাত্র—আর বাষ্প দ্বারা কল চালান, উত্তাপ দ্বারা কার্য্য সাধন মাত্র। এস্থলে উত্তাপ হইতে বাষ্প জন্মে আর বাষ্পের তেজ দ্বারা কল চালিত হয়।

প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্য্যঋষিগণ কাষ্ঠ সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতেন, এবং সেই অগ্নি যথাবিধি স্থাপন করিয়া তাঁহারা হোম করিতেন। এইরূপে অগ্নি উৎপাদন করার পদ্ধতি এখনও যাজ্ঞিক-সমাজে প্রচলিত আছে। কাশী ও দাক্ষিণাত্য জনপদে এখনও অনেককে এইরূপে অগ্নি উৎপাদন করিয়া যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিতে দেখা যায়।

উত্তাপ, কার্য্য, আলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি একই তেজের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। আলোক দ্বারা রাসায়নিক কার্য্য ঘটান যাইতে পারে, রাসায়নিক কার্য্য হইতে আবার উত্তাপ জন্মিতে

পারে; আবার উত্তাপ কার্য্যে ও কার্য্য উত্তাপে পরিবর্ত্তিত হয়। এক্ষণে সমুদয় প্রকার শক্তির পক্ষেই বলা যাইতে পারে যে, তাহারা পরস্পরের মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে; আর সকলেই কার্য্যে পরিণত ও কার্য্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। তাই হিন্দুশাস্ত্র বলেন, "কর্ম্মণা ক্রিয়তে কর্ত্তা, কর্ত্তা কর্ম্ম প্রণীয়তে।" কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তা এবং কর্ত্তা দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। কর্ম্ম শব্দের অর্থ এক প্রকার ক্রিয়ামাত্র। ক্রিয়া না থাকিলে কর্ত্তার, এবং কর্ত্তা না থাকিলে ক্রিয়ার অস্তিত্ব অনুভূত হইতেই পারিত না। কর্ম্ম হইতে কর্ত্তা, এবং কর্ত্তা হইতে কর্ম্ম নিষ্পাদিত হয়।

শ্রীনলিনীকান্ত বসু।

যোগবলে শারীরিক বলের পরিচয়।

অসংখ্য পুরাণ-ইতিহাসাদিতে আমরা যে শারীরিক বলের পরিচয় পাই, তন্মধ্যে যোগবল যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যিনি যেখানেই শারীরিক বল দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করতঃ লোকের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, সেখানে সকলের মধ্যেই যোগবল একমাত্র তাঁহার সম্বল ও সহকারীরূপে নিহিত আছে, ইহা স্থির জানিতে হইবে।

সকলেরই জানা উচিত যে, এই যোগ শুধু ভোগের সামগ্রী নহে। ভোগ-লালসা প্রভৃতি হইতে আসক্তিশূন্য হইয়া জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ধ্যেয় বস্তুর সহিত স্বীয় আত্মার সম্মিলনের নামই যোগ। ইহার মূলভিত্তি ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা শরীর সবল ও সুস্থ করিতে পারিলেই শারীরিক বলের কার্য্য আপনা হইতেই সম্পাদিত হয়।

জীবের প্রকৃতিগত শক্তির কথা স্বতন্ত্র; কেননা হস্তী অনায়াসে প্রকাণ্ড মহীরুহও স্বীয় শক্তিবলে ধ্বংস করিতে পারে। ইহা তাহার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষাহেতু অলৌকিক যোগবলে নয়। ইহা হস্তীরই প্রকৃতিগত স্বভাবসিদ্ধ শারীরিক বল।

কিন্তু মনুষ্য যদি তাহার মানবিক শক্তির অতীত অমানুষিক কোন শারীরিক বলের পরিচয় দেয়, তাহা কি ব্রহ্মচর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ আধ্যাত্মিক যোগবলে নয়? শারীরিক শক্তির মাত্রা অতিক্রম করতঃ অভাবনীয় কোন কার্য্য সাধিত হইলে যোগবল ব্যতীত তাহাকে আর কি বলিব?

অতীত যুগের কাহিনী স্মরণ করিয়া বলিতে হয়,—ক্রমেই আমরা যোগবল হারাইয়া শারীরিক শক্তি সাধনেও হীন হইয়া পড়িতেছি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে জানিতে পাই, মহামায়ার একটীমাত্র হুঙ্কারে অসুর ধূম্রলোচন ভস্মীভূত হইল। যথা—

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবত্তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম স চকারাম্বিকা ততঃ॥

এই একমাত্র হুঙ্কারে মহাশক্তির কি অলৌকিক শক্তি যে নিহিত আছে, তাহা আমরা জ্ঞানকর্ম্ম বিহীন মানব কিরূপে উপলব্ধি করিব ?

ধৃতবীর্য্য লক্ষ্মণের দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্যরক্ষাহেতু ইন্দ্রজিত নিধনই প্রাগুক্ত অলৌকিক শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইন্দ্রালয়ে উর্ব্বশীর অযাচিত প্রণয় উপেক্ষা, ভারতবিজয়ী অর্জ্জুনের অন্যতম শক্তির নিদর্শন। এইরূপ যেখানে যত কিছু শৌর্য্যবীর্য্য ও বলবিক্রমের পরিচয় পাই, সেই-খানেই বুঝিতে হইবে—প্রত্যেক বীরই অক্ষুণ্ণ যোগবলের সহায় ব্রহ্মচর্য্যহেতু অমানুষিক শারীরিক বলের পরিচয় দিয়া অক্ষয় যশ ও বীর-কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

আজ-কাল আমরা চতুরস্র অশ্বযোজিত চালিত শকটের গতিরোধ, বক্ষোপরি মাতঙ্গ উত্থাপন, দশ অথবা উর্দ্ধসংখ্যা বিংশতি মণ প্রস্তর-খণ্ড বক্ষোদেশে উত্তোলনকরতঃ অন্য কর্ত্তৃক লৌহ-মুদ্গর দ্বারা তাহার বিচূর্ণ করণ ইত্যাদি শারীরিক বলের পরিচয় পাইয়াই অতি আশ্চর্য্যান্বিত হই, এবং এমন কি স্বচক্ষে না দেখিলে তাহা বিশ্বাসও করিতে পারি না। কিন্তু এই ভারতেই এককালে কত কত বীর, শত শত অশ্ব যোজিত রথ, শত সহস্র মদমত্ত মাতঙ্গ, ভীম পরাক্রম প্রভঞ্জন পরাস্তকারী শৈলশিখর বিধ্বস্তকরতঃ অমিত শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে ?

যুগধর্ম্মে ও কালমাহাত্ম্যে সে সব শক্তি ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও সাধারণ অপেক্ষা কোন বলশালী ব্যক্তির বিক্রমের পরিচয় পাইলে পুরাকালীন বীরগণের নামের সহিত তাঁহাদের উপমা দেই। ভীমভবানী, রামমূর্ত্তি নায়ডু, শ্বাপদ-বশকারী শ্যামা-কান্ত প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের উন্নতির মূলসূত্র অটুট ব্রহ্মচর্য্য।

দিনের পর দিন যতই চলিয়া যাইতেছে, অতীত যুগের সেই সব স্মরণীয় দিন হইতে যতই আমরা দূরে চলিয়া যাইতেছি,—ততই যেন আমাদের সে সব বল আমাদের একরূপ অলক্ষ্যেই অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে।

শত বৎসর পূর্ব্বকার কোন বীরের সহিত তুলনায়,—বর্ত্তমান বীরগণের অপেক্ষা উহা অধিকতর অমানুষিক বলিয়া মনে হয়। আবার শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তাহারও পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কালের ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিলে তদপেক্ষা আরও অধিকতর বিক্রমের পরিচয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি।

বহুদিনের কথা,—রঙ্গপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার অন্তর্গত বরনপুর গ্রামবাসী কমল-নয়ন রায় নামে একজন অসীম যোগবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ,—স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে তত্তৎ-কালীন মুসলমান নবাব বাহাদুরেরও ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণকরতঃ নবাবদত্ত জমিদারী সনন্দ ও 'রায় চৌধুরী' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

একদা মুর্শিদাবাদ-প্রান্তবাহিনী পবিত্র গঙ্গাসলিলোপরি বদ্ধ পদ্মাসনে ভাসমান ধ্যানবিরত

কমলনয়ন রায়ের নিভৃত ইষ্টারাধনা লক্ষ্য করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর তাঁহার ধ্যান ভঙ্গের পর, সসম্মানে দরবারে আহ্বান করিয়া, তাঁহার ইষ্টকার্য্যের আনুকূল্য সাধন মানসে কতকগুলি জায়গীর প্রদানে প্রয়াসী হয়েন।

বিষয়-বিরাগী নির্লিপ্ত কমলনয়ন, নবাবের এই অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাঁহার তুষ্টিসাধন জন্য মাত্র একটি পরগণা 'ববনপুর' নবাবের নিকট হইতে গ্রহণ করেন।

নবাবও কমলনয়নের এই অসাধারণ ত্যাগস্বীকারহেতু অধিকতর শ্রদ্ধানত হইয়া কমলনয়নের বহুদিন ঈপ্সিত শ্রীশ্রী৺মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় অনেক সাহায্য করেন।

অদ্যাবধি উক্ত দেব-বিগ্রহের পাদপদ্মে কমলনয়নের নাম অস্পষ্ট অক্ষরে খোদিত আছে।

কমলনয়ন হইতে কয়েকপুরুষ নিম্নে, ৺সদাশিব রায়চৌধুরী বংশের মর্য্যাদানুযায়ী অসীম যোগবল সহ শারীরিক বলের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

পুণ্যসলিলা খরস্রোতা করতোয়ার সার্দ্ধক্রোশ ব্যবধান বাসভূমি হইতে ৺সদাশিব রায়-চৌধুরী প্রত্যহ পূজোপকরণাদি সহ অর্দ্ধহস্ত বেধ পরিমিত, একহস্ত সমচতুষ্কোণবিশিষ্ট যে একখানা প্রস্তরাসন করতোয়া তীরে আনয়ন করিতেন—বর্ত্তমানে প্রভূত বলশালী চারি ব্যক্তিও উহা স্থানান্তরিত করিতে অক্ষম।

ববনপুর গ্রামে ৺সদাশিবের বংশধর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের ৺শিবগৃহ-সন্নিহিত বহিঃপ্রাঙ্গনে উক্ত প্রস্তরাসনখানি অদ্যাপি ৺সদাশিব রায়চৌধুরীর অলৌকিক যোগ ও শারীরিক বলের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কথিত আছে,—কোন সময় রাজস্ব বাকী পড়ায় ৺সদাশিব রায়চৌধুরী মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারে সুদৃঢ় লৌহময় গৃহে আবদ্ধ ছিলেন। নিশাযোগে সদাশিব প্রহরীগণকে মন্ত্রশক্তিবলে নিদ্রাভিভূত করতঃ দৃঢ় লৌহদণ্ডগুলি বেত্রের ন্যায় বাঁকাইয়া তন্মধ্য হইতে নির্গত হয়েন। অনন্তর পদব্রজে পদ্মাতীর পর্য্যন্ত আগমন করিয়া নদী সন্তরণপূর্ব্বক পরপারে উপস্থিত হয়েন এবং আলয়স্থ হইয়া নির্ভীক যোগী পুরুষের ন্যায় ইষ্টকার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

বলা বাহুল্য, নবাববাহাদুর সদাশিব রায়ের এই অসীম যোগবল ও শারীরিক বলের পরিচয় পাইয়া পুরস্কার স্বরূপ বহুদিনের বাকী রাজস্ব হইতে অব্যাহতি দেন।

সমসাময়িক ঘটনা লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি সেকালে অতীব বিরল ছিল। সুতরাং বাঙ্গালীর নিকট হইতে বাঙ্গালীর ঘরের ইতিহাস-প্রাপ্তি একরূপ অসম্ভব। কাজেই, উল্লিখিত ঘটনার সময়-নিরূপণ একরূপ দুরূহ। তবে ববনপুর রায়চৌধুরী বংশের বংশনামা পাঠে জানা যায়, বর্ত্তমান জমিদার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী হইতে ৺সদাশিব ষষ্ঠপুরুষ উর্দ্ধতন।

ফল কথা, ইহা সত্য ত্রেতাদি যুগের কথা নয়, এই যুগে এই বাঙ্গালাদেশেই এমন মনীষিগণ বিচরণ করিয়াছেন, যাঁহাদের যোগবল ও শারীরিক বলের পরিচায়ক শত শত নিদর্শন অবলোকনে আমরা যে তাঁহাদেরই বংশধর হইয়া এতদূর অধঃপতিত হইয়াছি, একথা স্মরণেও লজ্জায় ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইতে হয়।

আজকাল পুরাণ ও পুরাতন কাহিনী অপর দেশীয় লোকের মুখ হইতে না শুনা পর্য্যন্ত নিজের ঘরের কথাও উপকথা বলিয়া মনে হয়।

উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে,—শুধু শারীরিক বল বলই নহে। তৎসহ আধ্যাত্মিক বলের সমন্বয় এবং তাহার প্রধান অবলম্বন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেই দেহ মনকে যথেচ্ছরূপে চালনা করতঃ অপার আনন্দ ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায়। শাস্ত্রেও আছে ঃ—

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যং বিন্দুধারণং॥ ইতি শিবসংহিতা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ শর্ম্ম রায়চৌধুরী।

দেবাস্থরের যুদ্ধ ও বৃত্রাস্থর বধ।

কশ্যপ সাগরের কূলে যে সকল জনপদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই দিক্ শোভা করিয়া অনেক বাণিজ্যপোতের গতিবিধিতে সমৃদ্ধিশালিনী নগরীরও সমুদ্ভব হইয়াছিল। যখন রত্নমালার ন্যায় শোভাসঞ্চারিণী হইয়া সুবর্ণময়ী অসত্রাবাদ দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তের দশা অনুকূল করিয়া রাখিয়াছিল, তৎকালে কান্তিমতী কয়াধুর পরিণয়গ্রন্থিতে বদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপু-ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ বন্ধুগণের সহিত আদিম জন্মস্থান ভাবিয়া সেই স্থান ভোগ করিতেছিলেন। অতঃপর তিনি অধিকতর সৌভাগ্যের আস্বাদন পাইবার সন্ধানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পথগামিদিগের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তাঁহারাই পূর্ব্বউপনিবেশবাসিদিগের কর্তৃক অসুর অভিধায় অভিহিত হইলেন। যেহেতু তাঁহারাই পূর্ব্বযাত্রিদিগের অনেক স্বার্থে ব্যাঘাত করিয়া তিনি আধুনিক মুলতান রাজ্যে একটি সুবিশাল ও অল্পপরিসর রাজ্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। এই রাজ্য অতি-অল্পকাল স্থায়ী হইলেও কালের মানচিত্রে কালের শেষ পর্য্যন্ত চিত্রিত থাকিবে।

শৌর্য্য, বীর্য্য, বল, বিক্রম, মানসিক তেজঃ ও বুদ্ধিমত্তায় তাৎকালিক আর্য্যদিগকে অতিক্রম করিয়া এই অসুর নামধারী শাখা তাঁহাদিগের হিংসা ও দ্বেষের বিষয় হইয়াছিল। বুদ্ধিকৌশলে ও পরিমার্জ্জিত বিদ্যার প্রভাবে অনেক অনেক নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া আদর ও সম্মান পাইবার উপযুক্ত হইলেও আপনাদের প্রাধান্য নাশের ভয়ে উভয়দলের মধ্যে কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া, ইহারা এক মহা যুদ্ধের কারণ হইল। ইহাই দেবাসুরের প্রথম যুদ্ধ নামে বর্ণিত আছে।

সুখৈশ্বর্য্যে লালিতপালিত হিরণ্যকশিপু রাজ্যবিস্তার করিয়া সুখে অতি-অল্প দিনই রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন। অমায়িক প্রকৃতিইত অনেক সময়ে অনেকেরই পতনের কারণ

হইয়া থাকে। কি কুক্ষণে, কি অশুভ মুহূর্ত্তেই একটি পুত্র হরিনগরীতে (Herat) জন্ম-গ্রহণ করিল। এই পুত্র যৌবনের প্রারম্ভেই নিজ পিতার প্রাণহননের গৌণ কারণ হইয়া দাঁড়াইল। আর্য্যদিগের লিপিতে ইহারই নাম সুখ্যাতির সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে।

উপযুক্ত ছাত্রের উপযুক্ত শিক্ষক জুটিয়া গিয়াছিল। যথার্থনামা ষণ্ডামার্ক বিকৃত হৃদয়ের ঘাতে ঘাতে যে সব টিপ্ দিতেছিল, কাণে কাণে যে বীজমন্ত্র পড়াইতেছিল, তাহারই প্রভাবে আর্য্যদিগের হর্ষ-নিকেতন প্রহ্লাদ একেবারেই বিগড়াইয়া গিয়াছিল। ইহারই ফলে সে মহনীয়কীর্ত্তি হিরণ্যকশিপুর প্রাণহরণ করিতে সক্ষম হইল। বলে আঁটিতে না পারিয়া কেবল কুমন্ত্রণার প্রয়োগে দেবপক্ষীয়েরা কার্য্যোদ্ধারের পথে ধাবিত হইল।

প্রহ্লাদ সিংহাসন ত্যাগ করিলে তাহা বিরোচনের হস্তে আসে। ইনি অতি শান্তস্বভাব ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন, সুতরাং ইনি বিবাদবিসম্বাদে রত না হইয়া দেবনামধারীদিগের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন। ইঁহার সময়ে অনেক বিষয়ের উন্নতি হইতে থাকে। এইরূপে কিঞ্চিদধিক কাল দশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ভূতপূর্ব্ব নরপতি প্রহ্লাদের অতি বিচক্ষণ ও অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রী উশনার করে আপনার পুত্র বলির ভারার্পণ করিয়া অকালে কালের প্রান্তে চলিয়া যান। আবার সামান্য সামান্য যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উশনার বুদ্ধি-প্রভাবে, অপরপক্ষে বৃহস্পতি মন্ত্রী থাকিলেও, কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে পারে নাই। বলি অতি দানশীল, দাতা ও ভোক্তা ছিলেন; সময়ে সময়ে মন্ত্রীরও পরামর্শ শুনিতেন না। তাঁহার কিরূপে পতন হইল বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া, অন্য প্রস্তাবের অবতারণা করা যাউক।

সুরগুরু বৃহস্পতি কোন কারণে দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া কিছুকাল নির্জ্জন-বাস করিতেছিলেন। এই অবসরে উশনার প্ররোচনায় অসুরগণ যুদ্ধানল উদ্দীপিত করিল। ব্রহ্মসভার অনুমোদনে ইন্দ্র ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপকে পুরোহিত-পদে বরণ করেন; ইঁহারই বুদ্ধিকৌশল-প্রভাবে দেবগণ যুদ্ধে জয়ী হইতে লাগিলেন। বিশ্বরূপ বড়ই উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। যুদ্ধাবসানে অসুরদিগের সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য, পরন্তু ব্রহ্মাবর্ত্তাধিকারে রাজ্য প্রদানের প্রস্তাব করায় ইন্দ্র তাঁহাকে বধ করেন। পিতা ত্বষ্টা ক্রোধের বশে প্রজ্বলিত হইয়া অন্য এক পুত্র বৃত্রের সহায়তায় প্রবল বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিলেন। অসুরদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ঐন্দ্রপদলাভ করিয়া বৃত্র প্রবল প্রতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কাহারও সাধ্য রহিল না যে তাঁহাকে সহসা পদচ্যুত করিতে পারে।

কুরুক্ষেত্র বা ব্রহ্মাবর্ত্তের উত্তরাংশে ত্রিপিষ্টপ নামক তিনটি উচ্চভূমি বিদ্যমান আছে। উহারই সন্নিকটে তড়িৎবিজ্ঞানবিদ্ দধীচিমুনির আশ্রম ছিল। মুনিবরের নিকট বিনীত প্রার্থনা জানাইলে তড়িৎবিজ্ঞানানুশীলনের ফলস্বরূপ এক অভিনব সংহারক যন্ত্রের সৃষ্টি হইল, কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কর্ত্তার সংহার সাধিত হইল। সেই অস্ত্র ইন্দ্রকরে শোভা পাইয়া, বৃত্রের জীবন হরণের কারণ হইল, এইরূপে দেবাখ্যাধারিগণ নিজের কার্য্যোদ্ধারে সক্ষম হইল।

হত্যাপাপে কলুষিত ইন্দ্র কিছুদিনের জন্য নির্ব্বাসিতের ন্যায় পূর্ব্বোত্তর-দেশে গমন করিয়া 'মানস-সরোবরে' অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর পুনরায় স্বীয় অধিকারে আগমন করিয়া সতেজে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। আবার সেই সংহারক যুদ্ধ উদ্ঘোষিত হইয়া উঠিল।

বলি দানে ও অজস্র অর্থব্যয়ে কাহাকেও বশে আনিতে পারেন নাই। যতদিন শুক্রাচার্য্য বার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়াও জীবিত ছিলেন,—দেবগণ কার্য্যতঃ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার দেহাবসানে, বলপ্রয়োগ, নানারূপ অভিসন্ধিপ্রয়ানের সহিত কৌশল, ছল ও চতুরতার একান্ত আতিশয্যে দেব-পক্ষীয় এক ব্যক্তির ছলনায় উচ্চস্থান 'মোলতান' হইতে বলি বহিষ্কৃত হইলেন। দানের প্রভাবে তিনি তাহাদের হিংসায় বশীভূত না হইয়া পঞ্চনদ প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া নিম্নভূমি সিন্ধুতীরে সিন্ধুনামা প্রদেশে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে সন্ধীসহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সিন্ধুর সাগরসঙ্গমের অনতিদূরে পাতাল নামক নগরের প্রতিষ্ঠা হইল। সেই স্থানের অবস্থিতি বাটলার সাহেবের মানচিত্রে দেখিতে পাইবেন। বলা-বাহুল্য ত্বষ্টা ইন্দ্রের সহোদর ভ্রাতা, বৃত্র বা বিশ্বরূপ তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র। এই দেবাসুর যুদ্ধ ব্রহ্মাবর্ত্তের নিকটে কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

সমুদ্রমেখলা সিন্ধুরাজ্যের পাতালপুরীতে ও নব নির্ম্মিতনগরী শোণিতপুরীতে বলি-পুত্র মহারাজ বাণ সুখ-ঐশ্বর্য্যে রাজ্য করিতে লাগিলেন। নানা দিক হইতে নানা জন আসিয়া দিক আলোকিত করিতে লাগিল।

যে সময়ে বিতাড়িত অসুরগণ সিন্ধুরাজ্যে রাজ্যবিস্তার করিতে থাকেন, সেই সময়ে নিকটবর্ত্তী আর এক রাজ্য কুশস্থলীতে আর এক ঘটনা ঘটিতেছিল। সেই ঘটনায় সম্মিলন ও ঘাত-প্রতিঘাতে এক মহা সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, ইহাই শেষ দেবাসুর যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই 'প্রহ্লাদীয়' অসুর-বংশ লোপ পায়।

শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক।

বিবাহ

বিবাহেই পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং সনাতন ধর্মই বিবাহ। সংসারই ধর্ম্মাশ্রয়ের প্রধান ক্ষেত্র। এইখানেই ঋষি সন্ন্যাসী সকলেরই ধর্ম্মসাধনা হয়। সংসার-ধর্ম্ম-পালন করিতে না পারিলে কোন ধর্ম্মেরই পালন হয় না। এই সুসভ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিবাহের গৌরব নষ্ট করিয়া লোকে বিবাহকে অর্থকরী ব্যবসায় করিয়াছে। ইহার ফলে কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতা-মাতা কন্যাদায়ে বিব্রত হইয়া অহরহ কন্যার মৃত্যু কামনা করেন। দরিদ্র তনয়ার যদিও বা কোন প্রকারে বিবাহ হয়, কিন্তু শ্বশুরগৃহে বা স্বামীসকাশে দরিদ্র কন্যা বলিয়া অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। বিবাহ যে মানবধর্ম্ম পালনের প্রধান সোপান শ্বশুরালয়ে তাহা কাহারও মনে থাকে না, পরন্তু পদে পদে ত্রুটী ধরিয়া বালিকা-বধূকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই অনেকেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এই পণ-প্রথার অত্যাচারে কত বালিকা অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে।

পরিণীতা স্ত্রী, ভার্য্যা, জায়া, পত্নী, সহধর্ম্মিণী, অর্দ্ধাঙ্গিণী পদের গৌরব এখন প্রায়ই লোপ হইয়াছে।

'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র' এখন আর খাটে না, বিবাহ অর্থে কিছু অর্থাগমই এখন বিবাহের উদ্দেশ্য বলিয়া উপলব্ধি হয়। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রাপিণ্ডপ্রয়োজনম্'; এখন ইহা লোকে বিস্মৃত হইয়াছে। দরিদ্রতনয়া বিবাহ করিলে 'পুত্রার্থে'র বদলে "দুঃখার্থে" ক্রিয়তে ভার্য্যা হইয়াছে। রামায়ণে শোনা যায়, রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন; কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞকালে সহধর্ম্মিণী ভিন্ন রাজার যজ্ঞের পূর্ণতা প্রাপ্তি হইবে না জানিয়া রামচন্দ্র স্বর্ণ-সীতা প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন। একদিন যে ভারতভূমিতে সহধর্ম্মিণীর এত গৌরব ছিল, এখন তাহা কোথায়? এখন সহধর্ম্মিণীকে পালন করিতে স্বামী-অনেক সময় বিরক্তি প্রকাশ করেন, এমন কি অনেক সময় 'আমি খাইতে দিতে পারিব না' বলিতেও কুণ্ঠিত হন না, শোনা যায়। 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ', মনুর এই নীতি বাক্যের সার্থকতা কোথায় থাকে? যে সংসার রমণী অশ্রুতে সিক্ত হয়, সে সংসারের মঙ্গল ও ধর্ম্ম কোথায়? এই সমস্তই পণ-প্রথার ফল বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে পণপ্রথা ছিল না, কাজেই পত্নীর গৌরব ছিল, সেই জন্য এত বাছাবাছিও ছিল না। পঞ্চপাণ্ডবমহিষী কৃষ্ণার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা ব্যাসদেব প্রাণ ভরিয়া করিয়াছেন। মহাভারতের এক স্থানে আছে—একদা এক ব্রাহ্মণের তপে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য দেবতারা পরামর্শ করিয়া তাহার ব্রাহ্মণীকে হরণ করিয়া বিল্ব-কাননের অধিপতি এক দৈত্যকে প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ যথাকালে ব্রাহ্মণীকে না দেখিয়া ব্রাহ্মণীর অনুসন্ধান জন্য রাজার নিকটে প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাজা ব্রাহ্মণ-পত্নীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর

দেখিলেন, বিল্ববনমধ্যে ব্রাহ্মণী বিব ভক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। রাজা কুৎসিতা ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন—এই কদাকার৷ ব্রাহ্মণীকে লইয়া কি করিবে? চল আমি সহস্র সুন্দরীর সহিত তোমায় বিবাহ দিব। ব্রাহ্মণ রাজার কথায় অস্বীকৃত হইয়া তাঁহার সেই কুরূপা ব্রাহ্মণীকেই প্রার্থনা করিলেন। তখন পঞ্চ হরিতকীর গৌরবে দাতা প্রদাতা উভয়েই গৌরবান্বিত ছিলেন। পূর্ব্বেও যৌতুক দেওয়া নিয়ম ছিল। তাহা ইচ্ছামত ও সাধ্যমত ছিল, এখন সাধ্যাসাধ্য দেখা নাই, দাও দাও রব। স্ত্রী হচ্ছেন গৃহ-দেবতা, বংশ-জননী কুলরক্ষয়িত্রী দেবী। সেদিন আর নাই, যেদিন 'পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভোভূত্বেহমাতরং, তস্যাপুনর্নবো-ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে।' এই সকল ঋষি-বাক্য পবিত্রতার সহিত উচ্চারিত হইত। যেদিন পণ-প্রথা উঠিয়া যাইবে, সেইদিন হিন্দুর গৃহে গৃহে বিবাহের মঙ্গলধ্বনি বাজিয়া উঠিবে। তখন আর বিবাহ নামে প্রাণে মহাভীতির সঞ্চার হইবে না, পূণ্য সনাতন ধর্ম্ম জাগিয়া উঠিবে। পণ-প্রথার ফলে সমাজপতিগণ সনাতন-ধর্ম্মের বিনাশ করিতেছেন ইহা যেন মনে রাখেন।

শ্রীযোগেশবালা দেবী।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের

একাদশ সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ।

(স্থাপিত ১৩১২ বঙ্গাব্দ, ১১ই বৈশাখ)

১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই সভা দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

নিম্নে এই সভার একাদশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ বিবৃত হইল :—

	আজীবন সদস্য	বিশিষ্ট সদস্য	অধ্যাপক সদস্য	সহায়ক সদস্য	ছাত্রসদস্য	সাধারণ সদস্য	একুন।
একাদশ বর্ষ ১৩২২	২	৬	৬	১২	৬০	৩৫২	৪৩৮

সদস্যের মৃত্যু।

আলোচ্য-বর্ষে পরিষদের সদস্য মৈমনসিংহ নিবাসী সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং রঙ্গপুর বাগদুয়ার নিবাসী সারদাগোবিন্দ তালুকদার মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমন সংবাদ সভা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছেন।

পাশ্চাত্যদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির জন্য অর্থকষ্ট উপস্থিত হওয়া সদস্য সংখ্যা হ্রাস হইবার কারণ।

অধ্যাপক সদস্য।

ছয়জন অধ্যাপক সদস্য মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয় ব্যতীত অন্য কেহই প্রবন্ধাদি রচনার দ্বারা সভাকে সাহায্য করেন নাই।

সহায়ক সদস্য।

বারজন সহায়ক সদস্য মধ্যে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয় প্রবন্ধ রচনা করিয়া এবং শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয় গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধান করিয়া সভাকে সাহায্য করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন সদস্যগণের নিকট হইতে সভা কোন সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই।

দশম সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

১১ই আষাঢ় রবিবার (১৩২২) তারিখে অপরাহ্ণ ৩॥০টার সময় রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের দশম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য্যারম্ভ হয়। কাকিনাধিপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী বিদ্যামুকুট মহোদয় পীড়িত হওয়ায় তাঁহার অনুরোধে রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ কালেক্টর এবং রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, আই সি এস্ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ সভার মুখপত্রে প্রকাশিত হইবে।

মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের বিষয়-বিভাগ।

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশন রঙ্গপুরে আহুত হওয়ায় আলোচ্য-বর্ষে মাত্র পাঁচটি অধিবেশনে সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র ছয়টি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল—ইহাদের বিষয়-বিভাগ, যথা,—ঐতিহাসিক—২, কৃষি-বিষয়ক—১, আলোচনামূলক—২, প্রাত্নতত্ত্বিক—১।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ।	পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক।	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক।	অন্যান্য আলোচনা।
১ম অধিবেশন, ২৬শে আষাঢ়, ১৩২২, ১১ই জুলাই, ১৯১৫। রবিবার।	রঙ্গপুর সৈদপুরের প্রাচীন বিবরণ। যতুনাথ ঘোষ বি, এ।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয়ের উপহৃত ;— (১) পদ্মাপুরাণ। (২) ময়নামতীর গান। (৩) ইমাম চুরি। (৪) নবীর জন্ম। (৫) একটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা। শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ চৌধুরী মহোদয়ের উপহৃত ;— হস্তলিখিত রামায়ণ ও মহাভারত।	
২য় অধিবেশন, ১৫ই ভাদ্র (১৩২২), ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৫, বুধবার।	ধামশ্রেণী শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি, এ।	১১৬৯ সনের নওয়াব আলিজান-ছরৎ জঙ্গ ইমতিয়াজোদ্দৌলা নসিরুল্ মুলুক কাশেম খাঁ বাহাদুরের একখানি ফার্ম্মাণ।	ভূতপূর্ব্ব সেসন্ জজ—সুকবি বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্ মহোদয়ের মৃত্যুতে ও কুচবিহারের পরলোকগত দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত, সি আই ই, বাহাদুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

অধিবেশন	পঠিত প্রবন্ধ	অন্যান্য কার্য্য
তৃতীয় অধিবেশন—১৩ই আশ্বিন ১৩২২, ৩রা অক্টোবর ১৯১৫, বুধবার।	(১) 'প্রচলিত কৃষি পদ্ধতি'—যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ। (২) বঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চ্চা—পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।	৺অম্বিকাচরণ গুপ্ত, যতীশচন্দ্র সমাজপতি ও কবি সুকুমারী দেবীর শোক প্রকাশ।
	...শাস্ত্রের উপকারিতা· পণ্ডিত ...ন তর্কতীর্থ।	উত্তর-ব সাহিত্য-সম্মিলন, নবম অধিবেশন, রঙ্গপুরে আহুত হইবার সংবাদ জ্ঞাপন।
একাদশ বার্ষিক পঞ্চম মাসিক অধিবেশন, ২৬শে মাঘ, ১৩২২, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬, বুধবার।	নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হও সর্ব্বসম্মতিতে এই অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়	

স্থগিত পঞ্চম অধিবেশন—২৭শে চৈত্র, ১৩২২, ৯ই এপ্রিল, ১৯১৬, রবিবার।

ধর্ম্মপালের তাম্র-শাসন—পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সরস্বতী এম্ এ।

মৃগশৃঙ্গাকৃতি পরগাছা—রমেশচন্দ্র রায়।

প্রবীন একনিষ্ঠ সাহিত্যিক সারদাগোবিন্দ তালুকদার—ব্যোমকেশ মুস্তোফী ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (মৈমনসিংহ) মহাশয়ত্রয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

যশোহরে আহূত নবম-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য এ সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন।

গ্রন্থ-প্রকাশ।

রঙ্গপুর নলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দকেলী মুন্সী মহাশয়ের ব্যয়ে "নিমাই চরিত্র", এ সভার গ্রন্থাবলী ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

সভার গ্রন্থাগার।

বঙ্গীয়-গভর্ণমেণ্টের প্রধান সচিব মহোদয় সদস্যগণের পাঠার্থ ভারতীয় প্রাত্নতত্বিক বিভাগ হইতে প্রকাশিত কার্য্যবিবরণী বিনামূল্যে প্রদান করিয়া সভার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে সভার গ্রন্থাগারে যে সকল পুস্তক উপহৃত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থের প্রচারকল্পে এবং গ্রন্থাকারদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত উপহৃত গ্রন্থগুলির বিজ্ঞাপন সভার মুখপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উপহৃত গ্রন্থ-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

চিত্রশালায় উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ।

আলোচ্য-বর্ষে চিত্রশালায় যে সকল ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ, আই, সি, এস্ বাহাদুর কর্তৃক উপহৃত পিত্তল নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞগণ আজ পর্য্যন্তও ঐ মূর্ত্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয় একটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয় একটি মৃগশৃঙ্গাকৃতি পরগাছা, ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত ১১৬৯ সনের নবাব মীর কাশিম কর্তৃক প্রদত্ত একখানি ফার্ম্মানের প্রতিচিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিত্রশালা পরিদর্শন।

বঙ্গদেশের মাননীয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর সভার চিত্রশালায় তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর ছবি উপহার দিয়া সভার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

রাজসাহী বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার মিষ্টার স্বামন্ সভার চিত্রশালায় শুভাগমন করিয়া সংগৃহীত দ্রব্যাদি দর্শন পূর্ব্বক প্রীত হইয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

পরিষদের নবচিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন।

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশন কালে মাননীয় বিচারপতি ডাক্তার স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, এম্, এ; ডি এল্; ডি, এস্ সি; কে, টি, সি, এস্, আই; এফ, আর, এ, এস্, এফ আর, এস্; ই; এফ, এ, এস্, ইত্যাদি) মহোদয় কর্তৃক নব নির্ম্মিত চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এতদুপলক্ষে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের খ্যাত নামা মনীষিগণ চিত্রশালার সংগৃহীত দ্রব্যাদি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। এই

চিত্রশালা নির্ম্মাণের জন্য যে উপকরণ লাগিয়াছে তাহার কিয়দংশ শ্রীযুক্ত পান্নালাল সিংহ, শ্রীযুক্ত নবরত্ন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল রায় মহাশয় প্রদান করিয়াছেন। লোহার বীম ও বরগা শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় প্রদান করিয়াছেন।

উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, রঙ্গপুর অধিবেশন।

আলোচ্য-বর্ষে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশন মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত ১৯২০ চৈত্র (১৩২২), ১২রা এপ্রিল (১৯১৬) শনি ও রবিবার, রঙ্গপুরে সম্পন্ন হইয়াছে। কাকিনার মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র-রঞ্জন রায়চৌধুরী বিদ্যামুকুট মহোদয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গের নানাস্থান হইতে সমাগত বাণীসেবকগণের আগমনে রঙ্গপুর ধন্য হইয়াছিল। সাহিত্যিকগণের পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের জন্য মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় ও রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর দুই দিনে দুইটি সান্ধ্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সম্মিলনের দশম অধিবেশন বগুড়ায় আহূত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট—(ক)

উপহৃত পুস্তকের নাম	উপহারদাতার নাম
মনোরমার জীবন-চিত্র	শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা
অঞ্জলি	„ হিরণ্যমোহন দাসগুপ্ত
শ্রীশ্রীভগবৎলীলামৃত	
শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (১ম খণ্ড)	
ধর্ম্মতত্ত্বের ধর্ম্মাঙ্গ (১০ পৃষ্ঠা)	
দান-ধর্ম্ম (১২ পৃঃ)	
শ্রীগঙ্গাস্তুতি শতকম্ (১২ পৃঃ)	
ভারত সাম্রাজ্যের প্রথম ঘোষণাপত্র (৬পৃঃ)	
গঙ্গাভাবাবলী (৩৬ পৃঃ)	কেশবলাল বসু
An address on the necessity of establishing an institution for the education of the sons of Bengal Zemindars. (১২ পৃঃ)	
Essay on Justice—Sujauddowla	
প্রতাপচন্দ্র রচিত বৈষ্ণবতত্ত্বদীপিকা	মধুসূদন দাস অধিকারী

গোবর গণেশের গবেষণা	" সতীপতি ভট্টাচার্য্য
আদর্শ জমিদারী	" কেশবচন্দ্র রাহা
হুগলী বা দক্ষিণরাঢ় পরলোকের পত্র	" অম্বিকাচরণ গুপ্ত
সাধনকল্প লতিকা ১।২।৩।৪।৫ খণ্ড	" নীলমণি মুখোপাধ্যায়
সারস্বত কৃত ভাষ্যং	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন
বঙ্গীয় মাহিষ্য পুরোহিত	
বল্লাল চরিত্র	" রাধাবিনোদ চৌধুরী
বিজয়াবসান	
শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়	
স্নেহময়ী	
উন্মাদিনী	" সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী
প্রেমাশ্রু	
বল্লরী	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি, এ,
ভারতবিহিত উপদেশমালা	পশুপতি ঘোষ
কবিতা কুসুমাঞ্জলি	দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন
কোরান প্রিয়পয়গম্বরের প্রিয়কথা	খান্ বাহাদুর তসলিম উদ্দীন আহম্মদ বি, এল্
পুরোহিত	" কুমার শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
জ্বরতত্ত্ব ও কীটাণুতত্ত্ব চিকিৎসাতত্ত্ব ও ভবৌষধ	" বৈদ্যরত্ন কালিদাস বিদ্যাভূষণ
সীতা নির্ব্বাসন	" বৈদ্যনাথ সান্যাল বি, এল্,
নবীনা	" কুলদাচরণ সরকার
প্রবন্ধ লহরী	" জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্, এ, বি, এল,
উপদেশ লহরী	" অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী
ব্যবহারিক কৃষিদর্পণ	" হেমচন্দ্র সেন
সহজ নমাজ শিক্ষা ইস্লাম ইতিবৃত্ত	মহম্মদ ছমীর উদ্দীন আহম্মদ
মৌলুদে জমিল	মহম্মদ নসির উদ্দীন খান্
Annual Report of the Archaeological Survey of India	Chief Secy. Bengal Govt.

Tantratattwa (1st part)
Tantra of the great Liberation } ....Justice J. G. Woodroffe
Principles of Tantra
Hymns to the Goddess
Tantrik Texts ,,
(Satachakra Nirupana & Pāduka Panchaka) ,,
,, Prapanchasara Tansa ,,
,, Kulachudamoni Tantra ,,
,, Tantravidhan, with Vija Nighanta Mudra Nighanta

পরিশিষ্ট—(খ)

সভায় উপহৃত পত্রিকা।

ত্রৈমাসিক—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

মাসিক—প্রবাসী, ভারতী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, নারায়ণ, গৃহস্থ, উৎসব, অর্চ্চনা, স্বাস্থ্য-সমাচার, বিজ্ঞান, ব্রাহ্মণ-সমাজ, অর্ঘ্য, সাহিত্য-সংবাদ, সাহিত্য-সংহিতা, জন্মভূমি, জগজ্জ্যোতিঃ, বাঁহী, প্রতিভা, বিক্রমপুর, তোষিণী, সৌরভ, হিন্দুসখা, শ্রীভূমি, উপাসনা, হিন্দুপত্রিকা, গম্ভীরা।

পাক্ষিক—Collegian,

সাপ্তাহিক—বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ঢাকা প্রকাশ, বিশ্ববার্ত্তা শিক্ষা সমাচার, হিন্দুরঞ্জিকা, রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ, গৌড়দূত, মালদহ সমাচার, সঞ্জয়, সুরমা, সুরাজ।

পরিশিষ্ট—(গ)

১৩২২ সনের আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়		ব্যয়	
চাঁদা আদায়	৫৩৮৸০	গভর্ণর বাহাদুরকে অভিনন্দন দিবার প্রশস্তি	
পত্রিকার মূল্য আদায়	৬৮।০	পত্র মুদ্রণ ব্যয়	৭০।/৩
চণ্ডিকা-বিজয়ের মূল্য আদায়	৭৵০	পত্রিকা-প্রকাশ	৩,৪৪৷৶৩
গৌড়ের ইতিহাসের মূল্য আদায়	৫৯৸০	পাবনা-কার্য্যবিবরণ-প্রকাশ	১০০৸৵৯
সেরপুরের ইতিহাসের মূল্য আদায়	৫৸০	গৌড়ের ইতিহাসের মূল্য প্রেরণ	৪৭৸৶০
সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলির মূল্য আদায়	১।০	গ্রন্থাগারের ব্যয়	১৪৸০
অদ্ভুতাচার্য্য রামায়ণের মূল্য আদায়	২৲	বার্ষিক অধিবেশন	৪৬৸৵৬
	৬৮৩৵০		৬২৫।৯

জের—	৬৮৩৵৴০
আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্টের মূল্য আদায়	১৲
সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মূল্য আদায়	২।০
তামাকের চাষের মূল্য আদায়	৪॥০
নিমাই চরিত্রের মূল্য আদায়	৸০
বার্ষিক অধিবেশনের সাহায্য	২০০৲
সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রকাশ	২৯৲
রাজোপাখ্যান নকল ব্যয় আদায়	২০৲
পুলিনবিহারী স্মৃতিরক্ষা	৩৩।৵০
গচ্ছিত টাকার সুদ আদায়	২৪২৸৵৬
ভি পি কমিশন আদায়	১৩৸৶০
পাবনা-কার্য্যবিবরণ-প্রকাশ ব্যয় আদায়	৩০০৲
মোট—	১৫৩০ ৶৬
গতবর্ষের তহবিল—	৩২০৭ ।৵০
	৪৭৩৮৶৬
বাদ খরচ—	১৫৭৫ ।৴০
	৩১৬২ ৸৵৬

জের—	৬২৫॥৯
দপ্তর সরঞ্জামী	২৩৸৶০
চিত্রশালার ব্যয়	১৩৶০
রঙ্গপুর ইতিহাস প্রকাশ	৪০৪।৶০
ডাক ব্যয়	৭৬৶৩
বেতন	২২০৩
পুলিনবিহারী স্মৃতিরক্ষা	৩৩।৵০
রাজসাহী-সম্মিলন ব্যয়	৩॥০
নিমাই চরিত্র প্রকাশ ব্যয়	৮৭।৯
রাজোপাখ্যান নকল ব্যয়	১০৲
সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রকাশ	৩৮৲
বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস প্রকাশ	।৴০
নিমাই চরিত্র প্রকাশ তহবিল হইতে চাঁদা বাবদে ব্যয়	১৪৲
বিবিধ মুদ্রন	২৫।০
	মোট—১৫৭৫।৴০

মঃ তিনহাজার একশত বাষট্টি টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা মাত্র।

পরিশিষ্ট—(ঘ)

I visited the Rangpur Sahitya Parishat Museum yesterday and was greatly interested in what I saw.

To-day I have noticed copies of the Society's publications for which I offer the Society my best thanks.

The Parishat is doing good work ; I wish it every success.

(sd) S. Sammun
Off. Commr. Rajsabi Division.
30. 8. 15.

অনুবাদ।

গতকল্য আমি পরিষৎ-চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া বিশেষ চমৎকৃত হইয়াছি।

অদ্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদি দেখিলাম, তজ্জন্য পরিষৎকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিষৎ অতি মহৎ কার্য্য করিতেছেন, আমি ইহার সাফল্য কামনা করিতেছি।

(সাক্ষর) এস্ স্থামন্,
রাজসাহী বিভাগের অস্থায়ী কমিসনার।
৩০-৮-১৫।

পরিশিষ্ট—(ঙ)

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ "রঙ্গপুর-শাখার সদস্য-তালিকা"

আজীবন-সদস্য।

শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবল মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বিদ্যারঞ্জন কে, সি, আই, ই,
" অন্নদামোহন রায় চৌধুরী জমিদার টেপা, রঙ্গপুর

বিশিষ্ট সদস্য।

কবি-সম্রাট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-রাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, রঙ্গপুর
শ্রীযুক্ত অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ, গৌহাটী
" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন বি, এল্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী
" কোকিলেশ্বর কাব্যতীর্থ-বিদ্যারত্ন-শাস্ত্রী এম, এ, কোচবিহার
" রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, লাসাভিলা, দার্জ্জিলিঙ্গ
" শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, বেগমপুর, শ্রীহট্ট

অধ্যাপক সদস্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য ৭৭ জঙ্গমবাড়ী, বেণারস
" " বনমালী বেদান্ততীর্থ বেদান্তরত্ন এম, এ, গৌহাটী
" " গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ঘোড়ামারা, রাজসাহী
" " ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পাবনা
" " যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শিমুলজানি, বাজলা পোষ্ট, ময়মনসিংহ
" " যদুনাথ তর্করত্ন-তর্ককণ্ঠ, রঙ্গপুর

সহায়ক সদস্য

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, রঙ্গপুর
„ „ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মকদুমপুর, মালদহ
„ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম, এ,
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর
„ গোপালকৃষ্ণ দে কর্জ্জন-হল-লাইব্রেরী গৌহাটী
„ উমেশচন্দ্র দে ডেপুটী কমিশনারের অফিস, ধুবড়ী
„ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, রঙ্গপুর
„ মোহিনীকুমার বসু সব্‌ডেপুটী রেজিষ্ট্রার, রঙ্গপুর
„ কেশবলাল বসু

সাধারণ সদস্য—১৩২২

(সদর)

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, বাহাদুর
„ আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই
„ ভবতারণ লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্
„ রাধাকৃষ্ণ রায় উকীল
„ সত্যেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার
„ কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন
„ মথুরানাথ দে মোক্তার
„ আশুতোষ মজুমদার বি, এল্
„ নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ,
„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল্
„ ভুবনমোহন সেন
„ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন
„ সতীশকমল সেন বি, এল্
„ নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল্
„ নলিনীকান্ত ঘোষ
„ কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম্ এস্
„ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ জমিদার
„ পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল্
„ নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোচবিহার ষ্টেট্
„ নরেশচন্দ্র বসু জমিদার
„ প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্
„ কেদারনাথ বাগছী, ম্যানেজার টেপা ষ্টেট্
„ দীননাথ বাগছী বি, এল্
„ যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল্
„ রমাচন্দ্র লাহিড়ী মোক্তার
„ যদুনাথ মিত্র
„ আশুতোষ মজুমদার নায়েব
„ বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
„ যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্,
„ পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ „ এককড়ি স্মৃতিতীর্থ
„ অক্ষয়কুমার সেন বি, এল্
„ যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল্
„ যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্
„ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল্
„ সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তার
„ কৃষ্ণশঙ্কর চৌধুরী
„ শরচ্চন্দ্র মজুমদার
„ মুকুন্দলাল রায়
„ রাধারমণ মজুমদার জমিদার
„ চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার
„ হরিনাথ অধিকারী
„ ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ মৌলবী খান তস্‌লীমুদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি, এল্
„ তৈয়বউদ্দীন আহাম্মদ
„ ডাক্তার মোহম্মদ মোজাম্মল
„ মৌলবী হাফেজউল্লা
„ সৈয়দ আবুলফতাহ সাহেব জমিদার
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ পূর্ণচন্দ্র নন্দী জমিদার
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
„ বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন
„ প্রিয়নাথ পাকড়াশী জমিদার
„ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
„ মৌলবী কোরবানউল্লা
„ যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার
„ নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র জমিদার
অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার
„ গোপীনাথ ঘোষ
„ শরচ্চন্দ্র বসু
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ, আই, সি, এস্
„ সিদ্ধেশ্বর সাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বি, জি, টেক্‌নিক্যাল স্কুল
„ বিশ্বম্ভর নাগ ষ্টেশন-মাষ্টার
„ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ,
„ গোপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ, হেডমাষ্টার তাজহাট স্কুল
„ গোপালচন্দ্র দাস ম্যানেজার ভগীষ্টেট
„ উপেন্দ্রনাথ সেন বি, এল্
„ কালিনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল্
„ সতীশচন্দ্র শিরোমণি
„ রোহিণীকান্ত মৈত্রেয়
„ কিশোরীমোহন হালদার
„ মোহান্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী জমিদার
„ ভৈরবগিরি গোস্বামী জমিদার
„ মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ লোকনাথ দত্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডিমলা-রাজ
„ বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য
„ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য পেস্কার
„ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
„ কুমার যামিনীবল্লভ সেন বাহাদুর
„ রঘুনাথ দাস জি, বি, ভি, সি,
„ মদনগোপাল নিয়োগী
„ নরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার
„ কুঞ্জবিহারী হার এম, এ, বি, এল্

সাধারণ সদস্য

(মফঃস্বল)

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার পাল

" অখিলচন্দ্র দাস গুপ্ত Sub Assist-Surgeon. Post Kisoriganj, Rungpur.

" অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল। 66 Lansdowne Road, Bhowanipur, Calcutta.

" অতুলচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল। Dy Magistrate & Collector, Noakhali.

" অতুলচন্দ্র দাস গুপ্ত পেস্কার। গোপালপুর, শ্যামপুর, রঙ্গপুর।

" অনাথবন্ধু চৌধুরী জমিদার। কামারপুকুর ; সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।

" অনাদিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। 3 Sukea's Row, Calcutta.

" অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, যশোহর।

" কুমার অমীন্দ্রনারায়ণ, পোঃ মোগরা, ত্রিপুরা।

" অমূল্যদেব পাঠক বি, এল, দিনাজপুর।

" অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, নায়েব, বোতলবাড়ী, সৈয়দপুর পোঃ (রঙ্গপুর)।

" আইনউদ্দিন আহম্মদ, Secretary, Kholahati Anjumana Hedayettal, Islamia, Gaibandha, Rangpur,

" আকবর হোসেন চৌধুরী, নোহালী, পোষ্ট ভূষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।

" মহামহোপাধ্যায় আগুনাথ ন্যায়ভূষণ, পোষ্ট গৌরীপুর, আসাম।

" আনন্দচন্দ্র সেন, গোয়ালপাড়া, আসাম।

" আনন্দলাল চৌধুরী জমীদার, রায়কালী, বগুড়া।

" চৌধুরী আমানত উল্যা আহাম্মদ, জমিদার, পোষ্ট বড়মরিচা, কুচবিহার।

" মৌলবী আমীরউদ্দিন আহম্মদ, উকীল। মেকলিগঞ্জ, কুচবিহার।

" মৌলবী মহম্মদ আমীরউদ্দিন খাঁ। ফরিদাবাদ, পোষ্ট শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।

" আব্দুল আজিজ চৌধুরী, জমিদার, মহীপুর, গঙ্গাঘণ্টা, রঙ্গপুর।

" আশুতোষ গুহ বি এল্, বালুবাড়ী, দিনাজপুর।

" অনরেবল জষ্টিস, আশুতোষ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্ Old Baliganj, Calcutta.

" অনরেবল জষ্টিস, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী, শাস্ত্র-বাচস্পতি, এম্, এ ; ডি, এল ; ডি, এস্ সি, সি ; এস, আই ; কে, টি ; এফ, আর, এ এস্ ; এফ, আর, এস, ই ; এফ, এ, এস, বি ; (ইত্যাদি) 77 Russa Road Bhowanipur Calcutta.

" ইয়ামত উল্যা সরকার, পোঃ কিস্মত ফতেমামুদ ; রঙ্গপুর।

" ঈশানচন্দ্র পালচৌধুরী, মুক্তাটী, পোষ্ট গুণের বাড়ী, ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য, মন্থনা বড়তরফ, পোষ্ট পীরগাছা, রঙ্গপুর।
„ উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী জমীদার সেরপুর, বগুড়া।
„ উমাকান্ত দাস বি, এল্, সৈদপুর, রঙ্গপুর।
„ কামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার, নায়েব, উলিপুর, রঙ্গপুর।
„ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গিয়া, আসাম।
„ কামিনীমোহন বাগচী, জমিদার, পোঃ বড়িয়া, রাজসাহী।
„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী, সাবরেজিষ্ট্রার, বরিশাল।
„ কালিদাস রায়, কবিশেখর, বি, এ; আসিষ্টাণ্ট হেড্ মাষ্টার, উলিপুর এইচ্, ই, স্কুল।
„ কালীকান্ত বিশ্বাস সবইন্স্পেক্টর অব্ পুলিশ জলঢাকা, রঙ্গপুর।
„ কালীকুমার ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজার মুস্তফী ষ্টেট, কোচবিহার।
„ কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল্ ২০নং মির আতার লেন ঢাকা।
„ কালিপদ ঘোষ ছোটকুঠী, পূর্ণিয়া।
„ কাশীকান্ত মৈত্রেয়, পাতালেশ্বর, বেণারস।
„ কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস, কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
„ কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„ কিশোরীমোহন চৌধুরী জমিদার, এম্, এ, বি, এল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ কুমুদনাথ চৌধুরী জমিদার, কুঠীবাড়ী, সেরপুর, বগুড়া।
„ কুমুদবিহারী রায় জমিদার, পোষ্ট পাঁচবিবি, গ্রাম দমদমা, বগুড়া।
„ কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী কলিগ্রাম, মালদহ।
„ কৃষ্ণকেশব গোস্বামী কাব্যতীর্থ কলিগ্রাম, মালদহ।
„ কৃষ্ণচরণ সরকার জমিদার কলিগ্রাম, মালদহ।
„ কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
„ কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার কালীতলা, দিনাজপুর।
„ কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার ইংরেজবাজার, মালদহ।
„ ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর, বরিয়া, রাজসাহী।
„ ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, ডি, ৭০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
„ গঙ্গাচরণ সেন গোয়ালপাড়া, আসাম।
„ কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ বার-এ্যাট্-ল কোচবিহার।
„ অনারেবল মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায়বাহাদুর কে, সি, আই, ই ভক্তিতত্ত্বমহার্ণব দিনাজপুর।
„ গিরীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।
„ গোপালচন্দ্র কুণ্ডু সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী দিনাজপুর।
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
„ গোপালচন্দ্র দাস ডাক্তার বদরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ গোপাললাল ভাদুড়ী সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পোষ্ট পাকুড়িয়া রাজসাহী।
„ গোপীনাথ কবিরাজ, দেবনাথপুর, বেণারস।
„ গোবিন্দকেলী মুনসী জমিদার, নলডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
„ গোলোকেশ্বর অধিকারী, সেরপুর, বগুড়া।
„ কুমার চন্দ্রকিশোর রায়, বর্দ্ধনকুঠী; পোষ্ট গোবিন্দগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ ছত্রনাথ চৌধুরী দুর্গাগঞ্জ, পূর্ণিয়া।
„ জগচ্চন্দ্র সরকার, হরিপুর, পুর্ণনগর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
„ জগদিন্দ্র দেব রায়কত, জলপাইগুড়ী।
„ জগদীশচন্দ্র মুস্তফী জমিদার পোষ্ট গোবরাছড়া, কোচবিহার।
„ জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি, এল্, চাঁপাই, মালদহ।
„ তারকচন্দ্র মৈত্রেয়, পোষ্ট বরিয়া পাকুড়িয়া, ইটালী, রাজসাহী।
„ তারাসুন্দর রায় বি, এল, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„ তিলকচন্দ্র ওসোয়াল হাজারী, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ ডি, ব্রেইনার্ড স্পুনার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া বাকীপুর।
„ দীননাথ সরকার মোলানখুড়ি, পোষ্ট কারাবাড়ী, রঙ্গপুর।
„ দুর্গাকমল সেন সবরেজিষ্টার, কালীতলা, দিনাজপুর।
„ দুর্গাচরণ সেনগুপ্ত সবইনস্পেক্টর অব পুলিশ, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„ কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ কোঙর পাঙ্গা, রঙ্গপুর।
„ দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; বোদা, জলপাইগুড়ী।
„ দ্বারকানাথ রায় বি, এল্, জমিদার পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, দেওয়ান গৌরীপুর-রাজ, গৌরীপুর, আসাম।
„ ধরণীধর অধিকারী ভোটমারী রঙ্গপুর।
„ নগেন্দ্রপ্রসাদ রায় বি, এল্, কোচবিহার।
„ নবসুন্দর সিংহ সরকার, বালাকুড়া; পোষ্ট ভেটাগুড়ী, কোচবিহার।
„ নবীনচন্দ্র সরকার পণ্ডিত কালীগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ রঙ্গপুর।
„ নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল্, বগুড়া।
„ নলিনীকান্ত অধিকারী বি, এল্, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
„ নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, দিনাজপুর।
„ নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার খানসিংপুর, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।

শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল সরকার, ডলু, কাছাড়।
" নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কীর্ত্তিধাম, ভাগলপুর।
" পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, হার্ডিং হোষ্টেল কলিকাতা।
" পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী, গোপালপুর, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
" প্রতাপচন্দ্র কুণ্ডু সৈদপুর, রঙ্গপুর।
" প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, দাদরা, বগুড়া।
" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার-য়্যাট-ল, গয়া।
" অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর গৌরীপুর, আসাম।
" প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল্, বগুড়া।
" প্রমথনাথ খান শ্যামগঞ্জ, পোষ্ট কুশাপুর, মেদিনীপুর।
" প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, নায়েব আহেলকার, দীনহাটা, কোচবিহার।
" প্রমথনাথ মুনসী জমিদার, পোষ্ট সেরপুর, বগুড়া।
" জষ্টিস্ স্যার্ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ।
" রায় চৌধুরী প্রমদারঞ্জন বকসী, জমিদার, কোচবিহার।
" প্রসন্নকুমার দাস, ভূষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।
" প্রিয়কান্ত বিদ্যারত্ন বি, এ, কোর্টসবইনস্পেক্টার অব্ পুলিশ জলপাইগুড়ী।
" প্রিয়নাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্ C/o ডাক্তার গঙ্গানাথ মিত্র বর্দ্ধমান।
" প্রিয়নাথ ভৌমিক আইসচাল কাছারী সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
" প্রিয়নাথ রক্ষিত খাটনগর, দিনাজপুর।
" প্রিয়নাথ লাহিড়ী চাঁচল, মালদহ।
" প্রিয়নাথ বিশ্বাস নীলফামারী রঙ্গপুর।
" বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্ দিনাজপুর।
" প্রেমচাঁদ ওসোয়াল হাজারী, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" বরদাকান্ত গাঙ্গুলী বি, এল্ দিনাজপুর।
" বরদাকান্ত রায় চৌধুরী জমিদার, ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর।
" বরদাগোবিন্দ চাকী গাইবান্ধা রঙ্গপুর।
" বরদাগোবিন্দ তালুকদার চৈত্রকোল, পোষ্ট বাগদুয়ার রঙ্গপুর।
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় হেডপণ্ডিত দমদমা এম্ ই, স্কুল, পোষ্ট পাঁচবিবি, বগুড়া।
" বসন্তকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর, পোষ্ট শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" বিনোদবিহারী দাস গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
" বিনোদবিহারী রায় ডাক্তার মালোপাড়া, রাজসাহী।
" বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন-বিদ্যানিধি রায়কালী বগুড়া।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্ মালদহ।
" বিমলাচরণ সেন গুপ্ত লাইব্রেরীয়ান ভিক্টোরিয়া কলেজ কোচবিহার।
" বিরাজকান্ত ঘোষ বি, এ, সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
" বিষ্ণুপ্রসাদ শর্ম্মা, দলইপাণ্ডা কামাখ্যা, গৌহাটী, আসাম।
" বেণীমাধব দাস গাইবান্ধা রঙ্গপুর।
" বীরেশ্বর সেন গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নদীয়া।
" বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জমিদার ভূতছাড়া, রঙ্গপুর।
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর বি, এল্ জমিদার সৈদাবাদ, মুরশিদাবাদ।
" ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ম্যানেজার কাঞ্চন কাছারী, পত্নীতলা, দিনাজপুর।
" ভগীরথচন্দ্র দাস মোক্তার গাইবান্ধা রঙ্গপুর।
" ভবানন্দ সরকার ফালিমারী, গোবড়াছড়া, কোচবিহার।
" ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য উকীল গাইবান্ধা রঙ্গপুর।
" ভূপেন্দ্রনাথ বাগছী, এলাহাবাদ।
" ভৈরবচন্দ্র অধিকারী ভোটমারী রঙ্গপুর।
" মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার সন্তঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
" রায় চৌধুরী মনোমোহন বক্সী জমিদার কোচবিহার।
" মন্মথনাথ মজুমদার সেক্রেটারী সারদাচরণ ফ্রি পাবলিক্ লাইব্রেরী হরিপুর, পাবনা।
" মহেন্দ্রনাথ অধিকারী কাননগো, দীনহাটা, কোচবিহার।
" মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্লক সিগ্‌ন্যাল ইন্‌স্পেক্টার সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
" মহেন্দ্রনারায়ণ মোহান্ত ভোটমারী, রঙ্গপুর।
" অনরেবল রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী, কাকিনা, রঙ্গপুর।
" মশরতউল্লা সরকার ডোমার, রঙ্গপুর।
" মাধবচন্দ্র শিকদার বি, এল্ দিনাজপুর।
" রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার সন্তঃপুষ্করিণী, পোষ্ট শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
" খান মোজাঃফর হোসেন চৌধুরী, পালিচড়া, পোষ্ট শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
" যতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ফতেপুর, ইটাকুমারী পোষ্ট, কালীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম, এ, বি, এল্ বরাহনগর ২৪ পরগণা।
" যতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল্ দিনাজপুর।
" যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামপুর রঙ্গপুর।
" যদুনাথ রায় বি, এল্ বালুরঘাট দিনাজপুর।
" অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম, এ, পি, আর এস, মোরাদপুর, পাটনা।
" যাদবচন্দ্র দাস ভুষভাণ্ডার রঙ্গপুর।

" যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল্ দিনাজপুর।

" অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ, মোরাদপুর, পাটনা।

" যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল্ দিনাজপুর।

" যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী হরিপুর, জীবনপুর, দিনাজপুর।

" যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এল্ এম্ এস্ বগুড়া।

" যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

" অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম, এ, রায় সাহেব, কটক।

" রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী উকীল দীনহাটা কোচবিহার।

" রজনীকান্ত নিয়োগী মুন্সেফী-আদালত নীলফামারী রঙ্গপুর।

" রজনীকান্ত মৈত্রেয় দিনাজপুর।

" রজনীকান্ত সরকার, বি, এল, নিলফামারী, রঙ্গপুর।

" রজনীকান্ত সরকার পোষ্ট রামবাড়ী, মালদহ, রাজসাহী।

" রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্ পাবনা।

ডাক্তার স্যার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিসম্রাট K T শান্তি-নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী জমিদার মৃজাপুর, পোষ্ট দেউলপাড়া বগুড়া।

" রাখালচন্দ্র চৌধুরী ধরাইল, রাজসাহী।

" রাজেন্দ্রমোহন রায়, রায়কালী বগুড়া।

" রাধাবিনোদ চৌধুরী খোলাহাটী, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।

" রাধাকান্ত সরকার জয়পুরহাট বগুড়া।

" রামকুমার দাস ইটাকুমারী, পোষ্ট কালীগঞ্জ, রঙ্গপুর।

" রামচন্দ্র সেন বি এল, দিনাজপুর।

" রামপদ ঘটক গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, পি, আর, এস্, ৮ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

" লক্ষ্মীনারায়ণ রায় কবিভূষণ গোপালরায়, পোষ্ট কাকিনা, রঙ্গপুর।

" কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, দয়ারামপুর, রাজসাহী।

" শরচ্চন্দ্র দাস মকদমপুর, মালদহ।

" শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

" শরদিন্দুনারায়ণ রায়-সাহেব এম্, এ, প্রাঙ্গ দিনাজপুর।

" শরচ্চন্দ্র সিংহ রায় জমিদার পীরগঞ্জ, রায়পুর, রঙ্গপুর।

" শাহ্ মজিদলহক কাদেরী, বালাবামুনিয়া, পোষ্ট তুলসীঘাট, রঙ্গপুর।

" শশিকিশোর চন্দ্র বি, এল্ পোষ্ট নওগাঁ রাজসাহী।

" শশিভূষণ ঠাকুর, বরিয়া, রাজসাহী।

শ্রীযুক্ত শশিমোহন ঠাকুর বরিয়া, রাজসাহী।
„ শশিশেখর মৈত্রেয়, পোষ্ট তালন্দ, রাজসাহী।
„ শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর।
„ শেখ্ শাহ আবদুল্লা বোনারপাড়া, রঙ্গপুর।
„ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, পোষ্ট আন্দুল, হাওড়া।
„ শ্রীরাম মৈত্রেয়, বলিহার-রাজকাছারী, পোষ্ট মহাদেবপুর, রাজসাহী।
„ সতীশচন্দ্র গোস্বামী মোক্তার নওগাঁ রাজসাহী।
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নবগ্রাম, মৈমনসিংহ।
„ সতীশচন্দ্র নিয়োগী আদমদীঘি, বগুড়া।
„ সতীশচন্দ্র রায় বি, এল্ দিনাজপুর।
„ সতীশচন্দ্র বড়ুয়া জমিদার খড়িয়ালডাঙ্গা, পোষ্ট আগমনী, গোয়ালপাড়া, আসাম।
„ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল, নীলফামারী রঙ্গপুর।
„ সত্যভূষণ বন্দোপাধ্যায় ১১নং কাশীনাথ বসুর লেন, সিমলা, কলিকাতা।
„ সর্ব্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী কাকিনা, মহুলক্ষণ, রঙ্গপুর।
„ সারদাগোবিন্দ তালুকদার, পোষ্ট বাগডহর, চৈত্রকোল, রঙ্গপুর।
„ পণ্ডিত সারদাচন্দ্র কাব্যতীর্থ কবিভূষণ, দিনাজপুর রাজবাড়ী পোষ্ট, দিনাজপুর।
„ সারদানাথ খান্ বি, এল্ বগুড়া।
„ সারদাপ্রসাদ লাহিড়ী পোষ্ট দুনখাওয়া, ভায়া ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর।
„ সারদামোহন রায় জমিদার পোষ্ট হরিদেবপুর, ঐ
„ সীতানাথ অধিকারী এম, এ, বি, এল্ পাবনা।
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার সন্তঃপুষ্করিণী শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার পোষ্ট নলডাঙ্গা, ঐ
„ সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী জমিদার সবরেজিষ্টার ডোমার, ঐ
„ সুরেন্দ্রনাথ বক্সী জমিদার ইনাতপুর বড়তরফ, পোষ্ট মহাদেবপুর, রাজসাহী।
„ সুরেশচন্দ্র সরকার জমিদার ৪১নং পদ্মপুকুররোড, কলিকাতা।
„ সূর্য্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, সবরেজিষ্টার দেবীগঞ্জ, জলপাইগুড়ী।
„ হরিদাস পালিত কলিগ্রাম মালদহ।
„ হরিপ্রসাদ অধিকারী হরিদেবপুর, রঙ্গপুর।
„ হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম, এ, বি, এল্ চিফ অফিসার কাশিমবাজার রাজ, মুরশিদাবাদ।
„ হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ কলসকাঠি, বরিশাল।
„ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার নীলফামারী, রঙ্গপুর।
„ হরেন্দ্রনারায়ণ সরকার কাকিনা, রঙ্গপুর।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্ এটর্ণী ১৩১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

" হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার ষবনপুর, গোবিন্দগঞ্জ, রঙ্গপুর।

" হেমায়েৎ উদ্দীন আহাম্মদ সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।

" এন্, বন্হাম্ কার্টার, আই সি, এস, কমিশনার রাজসাহী ডিবিসান।

" এফ, জে মোনাহান, এস্কোয়ার, আই, সি, এস্ কমিশনার প্রেসিডেন্সী ডিবিসান।